দ্বি-মাসিক
শ্রমিকবার্তা
পঞ্চম বর্ষ ● সংখ্যা: ১৯
মে-জুন ২০২২

রোজা এবং ঈদ :
বাংলাদেশের মুসলিম সংস্কৃতিমানস

শ্রমজীবীদের বাজেট কেমন চাই

ইসলামে শ্রমিকের অধিকার ও মর্যাদা

ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের দায়িত্ব ও কর্তব্য

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসে কথকতা
শ্রমের গুরুত্ব ও শ্রমিকের অধিকার

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
আর নয় ভাড়ায় বাড়ী
ভাড়ার টাকায় নিজের বাড়ী
কিনলে চল কর্ণফুলী ।
আমাদের প্রতিষ্ঠান সমূহ:
কর্ণফুলী ডেভেলপারস্ (প্রাঃ) লিঃ
কর্ণফুলী হাউজিং
কর্ণফুলী গ্রীণ টাউন লিঃ
কর্ণফুলী ফুড প্রোডাক্টস লিঃ
এম.রহমান বিল্ডার্স
ফ্ল্যাট সাইজ
এ : ১৪০০ বর্গফুট
বি : ১৪০০ বর্গফুট
সি : ১৪০০ বর্গফুট
ডি : ১৪০০ বর্গফুট
রেডি ফ্ল্যাট
বিক্রয় চলছে
KGL
কর্ণফুলী গ্রুপ লিঃ
কর্ণফুলী গ্রুপ লিমিটেড
সম্পূর্ণ তৈরী প্লট, ফ্ল্যাট, বাড়ী এককালীন ও কিস্তিতে বিক্রয় চলছে
(ইসলামী শরিয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত)
টমছমব্রীজ, কুমিল্লা। মোবাইল : ০১৭১১-১১৮২৯৮, ০১৯৪১-৮৫৬২৬১
e-mail: karnafuly_housing@yahoo.com, Web: www.karnafulygroup.com
কর্ণফুলী সাউথ ভিউ টাওয়ার
টমছমব্রীজ,কুমিল্লা

দ্বি-মাসিক
শ্রমিকবার্তা

৬ষ্ঠ বর্ষ ■ সংখ্যা: ১৯
মে-জুন ২০২২

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আ.ন.ম শামসুল ইসলাম

সম্পাদক
অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান

নির্বাহী সম্পাদক
অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন

সম্পাদনা সহযোগী
নুরুল আমিন
আজহারুল ইসলাম
আবুল হাসেম

সার্কুলেশন
আশরাফুল আলম ইকবাল

কম্পিউটার কম্পোজ
আহমাদ সালমান

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
ইউসুফ ইসলাম

প্রকাশকাল
এপ্রিল : ২০২২

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
www.sramikkalyan.org

মূল্য : ৩০ (ত্রিশ) টাকা

সূচিপত্র

■ **আমলের শুদ্ধতা ও পূর্ণতা নিয়তের উপর নির্ভর করে** ৩
মাওলানা তোফাজ্জল হোসেন হেলালী

■ **আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসে কথকতা শ্রমের গুরুত্ব ও শ্রমিকের অধিকার** ৫
অধ্যাপক মজিবুর রহমান

■ **বিশ্ব নবীর পরিবারে তিনজন গোলাম** ১২
অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

■ **রোজা এবং ঈদ : বাংলাদেশের মুসলিম সংস্কৃতিমানস** ১৬
ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ

■ **শ্রমজীবীদের বাজেট কেমন চাই** ২০
ড. মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম

■ **শ্রমিক নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকার** ২৪
অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান
এম এ ফয়েজ হোসেন
বাহারানে সুলতান বাহার
মাহতাব উদ্দিন সহিদ
রফিকুল ইসলাম সুজন

■ **ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের দায়িত্ব ও কর্তব্য** ৩১
অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান

■ **নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি বিড়ম্বনা ও প্রতিকার** ৩৫
অ্যাডভোকেট সাকিবুন্নাহার মুন্নি

■ **ইসলামে শ্রমিকের অধিকার ও মর্যাদা** ৩৮
আলী আহমাদ মাবরুর

■ **পলাশী বিপর্যয় : আজকের প্রেক্ষাপট** ৪২
মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান

■ **আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসের আহবান** ৪৫

■ **ফেডারেশন সংবাদ** ৪৭

সম্পাদকীয়

মে দিবস একটি সংগ্রামের নাম। সংগ্রামের মধ্য দিয়েই এর উদ্ভব। আমাদের দেশে নানান আয়োজনে মে দিবস পালিত হয়ে আসছে। স্বাধীনতা উত্তরকাল হতেই আমাদের দেশে এ দিবসকে ঘিরে সভা-সমাবেশ, মিছিল, আলোচনা সভা,এবং সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা হয়ে থাকে। কৃষক, শ্রমিক, মুটে-মজুর সব শ্রেণি পেশার শ্রমজীবী মানুষ মে দিবস উদযাপনে তৎপর। এমনকি রাজনৈতিকভাবে সরকারী দল, বিরোধী দল সবাই মে দিবসে অনেক কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। শুধু পার্থক্য রয়ে যায় শ্রমজীবী মানুষের পরিকল্পনা ও উদ্যোগ ও জীবন যাপনে। শ্রমজীবী মানুষের উদ্যোগে মে দিবস পালনে থাকে ভিন্ন মাত্রা। বিনোদন আনন্দ উল্লাসের বিপরীতে নানান দুঃখ, কষ্ট বেদনার পঙতিমালায় তারা এ দিবসকে বরণ করে। শোষণ বঞ্চনা নির্যাতন থেকে মুক্তির জন্য থাকে হৃদয়ের হাহাকার আর শোষকদের প্রতি হৃদয়ের বোবা কান্নার আর্তনাদ। আনন্দ উল্লাসের বিপরীতে হতভাগা বঞ্চিত মানুষের একটিই স্লোগান বাঁচার মতো বাঁচতে চাই,ন্যায্য অধিকার চাই।

দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন পাগলা ঘোড়া তছনছ করে দিচ্ছে স্বাভবিক জীবনযাত্রা। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। বাজারের টালমাটাল অবস্থায় মানুষ অসহায় হয়ে পড়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম এতটাই বেড়েছে যে সাধারণ মানুষ তা ছুঁতে পারছে না। সেই সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে সেবা এবং জ্বালানির মূল্য। হাসপাতাল, পরিবহন, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি-সর্বত্রই লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে দাম। যদি একটু গভীরে তলিয়ে দেখি তাহলে দেখা যাবে স্থায়ী খরচগুলো কি পরিমাণ বেড়েছে। ঘর ভাড়া, যাতায়াত খরচ, বিদ্যুৎ বিল, পানি বিল, গ্যাস বিল যখন কমানো যাচ্ছে না; তখন বাধ্য হয়ে খাবারের উপরে চাপ পড়ছে। খাবারের ব্যয় কমিয়ে আনার চেষ্টা করছে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। কৃষক, গার্মেন্টস শ্রমিক, রিকশা শ্রমিক, পাটকল শ্রমিক এবং হকারদের অবস্থা আরও শোচনীয়। ব্যয় বাড়লেও তাদের আয় বাড়েনি। ভালো-মন্দ খাওয়া তো দূরের কথা, তিনবেলা ভাত খাওয়াই তাদের জন্য দায়।

মাসব্যাপী কঠোর সিয়াম সাধনার পর রমজানের আত্মশুদ্ধির মহান দীক্ষার মধ্য দিয়ে মুসলমানদের জীবনে আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে পবিত্র ঈদুল ফিতর। দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কর্তৃক ঘোষিত পুরস্কারের প্রত্যাশায় এই ঈদ অনেক বেশি মহিমান্বিত ও আনন্দঘন। মাসব্যাপী কঠোর সিয়াম সাধনার মূল উদ্দেশ্য থাকে তাকওয়া অর্জন। আর তাকওয়া অর্জনের জন্য ধনী-গরীব বিবেচ্য বিষয় নয় , বিবেচ্য হলো যিনি তাকওয়া অর্জন করেছেন। এই তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমে একজন মালিক তার অধঃস্থনদের ব্যাপারে আরও যত্নবান হবেন, শ্রমিক যত্নবান হবেন তার মালিক কর্তৃক অর্পিত আমানত এবং নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে। পবিত্র ঈদ উপলক্ষে এটাই আমাদের আন্তরিক কামনা। ঈদ আনন্দময় হোক, এই প্রত্যাশার সাথে সাথে আমরা দ্বি-মাসিক শ্রমিক বার্তার সকল পাঠক, লেখক, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ী ও দেশবাসীকে জানাই ঈদের শুভেচ্ছা। ঈদ মোবারক।

আমলের শুদ্ধতা ও পূর্ণতা নিয়তের উপর নির্ভর করে

মাওলানা তোফাজ্জল হোসেন হেলালী

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْه)

সরল অনুবাদ

আমীরুল মু'মিনীন আবু হাফ্স উমর উবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসুলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি: "নিশ্চয়ই সকল কাজের ফলাফল নির্ভর করে নিয়তের উপর, আর প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পাবে যা সে নিয়ত করে। সুতরাং যে ব্যক্তি হিজরত করেছে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উদ্দেশ্যে, তাঁর হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উদ্দেশ্যে হয়েছে, আর যার হিজরত দুনিয়া পাওয়ার জন্য অথবা কোন নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হয়েছে, তাঁর হিজরত সে উদ্দেশ্যেই গণ্য হবে যে জন্য সে হিজরত করেছে। (বুখারী ০১, মুসলিম ১৯০৭, এছাড়াও আবু দাউদ, আহমাদ, তিরমিযী ও নাসায়ী শরীফে রয়েছে)

হাদীসের মর্যাদা:

আল্লামা ইমাম নববী (রহ.) বলেন, সকল মুসলিম এ হাদীসের শ্রেষ্ঠত্ব, অধিক উপকারিতা এবং সর্বাধিক বিশুদ্ধতার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। (শরহু মুসলিম নববী: ১৩-৪৭)

ইমাম সাফেয়ী (রহ.) বলেন- এ হাদীসটি দ্বীনের যাবতীয় ইল্ম বা জ্ঞানের এক তৃতীয়াংশ এবং ফিকহ শাস্ত্রের সত্তরটি অনুচ্ছেদে (প্রমাণ, প্রতিপাদ্য বা অন্য যে কোনভাবে) উল্লেখিত।

ওলামায়ে কেরাম এ হাদীসের দ্বারা কিতাব লেখা আরম্ভ করা মুসতাহাব মনে করতেন। আর তাদের মাঝে সর্বপ্রথম এ কাজটি উদ্ভাবন করেছেন ইমাম বুখারী (রহ.)। (শরহুল অববাঈন লিবনে দাকীকুল ঈদ, পৃ-৩)

আবার এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে অভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে।

রাবীর পরিচয় :

হাদীসটির বর্ণনাকারী উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) তাঁর মূল নাম 'উমার' উপনাম: আবু হাফস, উপাধি: আল ফারুক, পিতার নাম: খাত্তাব, মাতার নাম: হানতামা বিনতে হাশিম ইবনে মুগীরাহ, তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট সাহাবী ও ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা, ৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর জন্ম, তিনি বয়সে রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে ১৩ বছর ছোট, হিজরতের সময় তাঁর বয়স ছিল ৪০ বছর। নবুওয়াতের ৫ম মতান্তরে ৬ষ্ঠ বছরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পরপরই ইসলাম প্রকাশ্যতা লাভ করে তাই স্বয়ং রাসূল (সা.) তাকে আল ফারুক উপাধিতে ভূষিত করেন।

প্রথম খলীফা আবু বকর (রা.)-এর ইন্তেকালের পর হিজরী ১৩ সালের ২৩ জুমাদাল মাসে তিনি খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ১০ বছর ৬ মাস দায়িত্ব পালন করেন। তার বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৫৩৯ টি। মসজিদে নববীতে এশার নামাজের ইমামতি করার সময় মুগীরা ইবনে শো'বার অগ্নিপূজক ক্রীতদাস আবু লু'লু বিষাক্ত তরবারি দ্বারা উমর (রা.) কে মারাত্মকভাবে আঘাত করে। ৩ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ২৭ই যিলহজ্জ তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

হাদীস বর্ণনার প্রেক্ষাপট:

এ হাদীসটি মক্কার জনৈক ব্যক্তির মদিনায় হিজরতকে কেন্দ্র করে বর্ণিত হয়েছে, যিনি উম্মে কায়েস নামক এক মহিলা ইসলাম গ্রহণ করে রাসূল (সা.) এর নির্দেশ মোতাবেক মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করলে তাকে বিয়ে করার জন্য মদিনায় হিজরত করেন। জনৈক ব্যক্তির হিজরতের উদ্দেশ্য ছিল উম্মে কায়েসকে বিয়ে করা। হযরত জিবরাইল (আ.) এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.) বিষয়টি অবগত হন। রাসূল (সা.) তখন মুহাজির সাহাবীদেরকে ডেকে আলোচ্য হাদীসটি বর্ণনা করেন।

হাদীসের গুরুত্ব:

আলোচ্য হাদীসে নিয়তের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। মানুষ যে নিয়তে কোনো কাজ করে তার ফলাফল সে আলোকেই হয়ে থাকে। এক কথায় মানুষের সকল কাজের ফলাফল তার নিয়তের উপর নির্ভর করে। আর ইবাদতের ক্ষেত্রে এ নিয়তের ব্যত্যয় ঘটা ইসলামে অনুমোদিত নয়, আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَ مَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ۬ ۙ حُنَفَآءَ وَ يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَ ذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ؕ

অনুবাদ: তাদেরকে তো এছাড়া আর কোন হুকুম দেওয়া হয়নি যে, তারা নিজেদের দ্বীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদাত করবে, নামায কায়েম করবে ও যাকাত দেবে, এটিই যথার্থ সত্য ও সঠিক দ্বীন। (সুরা আল বাইয়েনাহ-৫)

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ এর মর্মার্থ:

রাসূলুল্লাহ (সা.) বাণী "সকল কাজের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।" অর্থাৎ প্রত্যেক কাজের বিশুদ্ধতা ও প্রতিদান নিয়তের উপরেই নির্ভরশীল। এর ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরাম বলেন- সকল আমল বা কাজ বিশুদ্ধ বা অনুমোদিত ও গ্রহণযোগ্য হয় নিয়তের দ্বারা। উক্ত অর্থের উপর নির্ভর করেই সকল কর্ম দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয় শরঈ ঐ আমলগুলো যা পালনের ক্ষেত্রে নিয়ত আবশ্যক আর স্বভাবগত কাজ।

যেমন: পোশাক পরিধান, খাবার ইত্যাদির ক্ষেত্রে নিয়তের আবশ্যকতা নেই। অন্যদিকে **الْأَعْمَالُ** বা সকল কাজ শব্দটি **عام** বা ব্যাপকতার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

মনে রাখা জরুরী: যে কোন কাজের নিয়ত ঠিক বা বিশুদ্ধ না হলে কাজ সঠিক হতে পারে না। ইমাম আহমাদ বলেন- নিয়ত দ্বারা একজন আমলকারী তার নফসের চিকিৎসা এভাবে করবে যে, সে যখন কোন আমল করবে তখন তার উদ্দেশ্য থাকবে কেবলমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জন। কোন মানুষের সন্তুষ্টি অর্জন তার লক্ষ্য হবে না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে হযরত আবু উমামা (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল (সা.) বলেন- "যে ব্যক্তি কাউকে ভালোবাসলো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সে প্রকৃত ঈমানের পূর্ণতা লাভ করল।" (আবু দাউদ-৪৬৮১)

আলোচ্য কথাটিতে (সকল কাজের ফলাফল নির্ভর করে নিয়তের উপর) দ্বারা অল্প শব্দে অধিক অর্থ বুঝানো হয়েছে। শব্দগত দিক থেকে নিয়ত এক ধরনের ইচ্ছাকে বুঝালেও অর্থগতভাবে এর দু'টি দিক রয়েছে।

প্রথমত: এক ধরনের ইবাদতকে অন্য ধরনের ইবাদত থেকে আলাদা করা। যেমন: যোহরের সালাতকে আসরের সালাত থেকে।

দ্বিতীয়ত: আমলের ক্ষেত্রে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে পৃথকীকরণ করা। অর্থাৎ আমলটি একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হচ্ছে কিনা তা স্পষ্ট করা। ভাল মন্দ সকল কাজের ফলাফল নির্ভর করে ব্যক্তির নিয়তের উপর। যে কোন কাজের দু'টি দিক রয়েছে একটি অভ্যন্তরীণ অন্যটি বাহ্যিক। এক্ষেত্রে প্রথম দিকটি (সকল কাজের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভর করে) এ মহা সত্যকে ধারণ করে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম (সুরা মূলক-২)

ফুদাঈল (রহ.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন- "যে আমল একনিষ্ঠ এবং সুন্নাহর মানদণ্ডে বিশুদ্ধ তাই উত্তম আমল। আর এ আমলই কেবল আল্লাহ তা'য়ালার নিকট গ্রহণযোগ্য হবে।"

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সা.) বলেছেন; "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের বাহ্যিক চাল-চলন ও সম্পদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, বরং তিনি দৃষ্টিপাত করেন তোমাদের অন্তর ও আমলের প্রতি।" (মুসলিম-৬৩১১)

সুতরাং আমলের ক্ষেত্রে একনিষ্ঠতা আবশ্যক।

নিয়তের পরিচয়:

নিয়ত শব্দের অর্থ ইচ্ছা ও সংকল্প করা। পরিভাষায় নিয়ত হল- মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও তাঁর আদেশ পালনার্থে কোন কাজের দিকে মনের ঐকান্তিক আগ্রহ ও অভিপ্রায় প্রয়োগ করা।

وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ এর ব্যাখ্যা:

প্রিয় নবী (সা.) এর বাণী: "আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করে তা-ই পাবে।" অর্থাৎ একজন আমলকারী কাজের প্রতিদান পাবে নিয়ত অনুসারে। সুতরাং ব্যক্তির নিয়ত যদি ভাল থাকে তার কর্মটিও ভাল হবে এবং সে অনুযায়ী পুরস্কার লাভ করবে। অন্যদিকে নিয়ত মন্দ হলে কর্ম ও মন্দ হবে এবং খারাপ পরিণতি ভোগ করবে।

সকল আমলের শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা, গ্রহণযোগ্যতা-অগ্রহণযোগ্যতা অথবা পুরষ্কার-তিরষ্কার নিয়তের উপর নির্ভরশীল।

এখানে امْرِئٍ (ইমরিউন) শব্দটি নাকেরা বা অনিষ্টকালের শব্দ। এর সাথে لِكُلِّ (লিকুল্লি) শব্দ জোড়ে দিয়ে এটিকে আরও ব্যাপক অর্থবোধক করা হয়েছে। ফলে নারী-পুরুষ, ছোট-বড়ো, ধনী-গরীব সকল শ্রেণির মানুষ এর অন্তর্ভূক্ত।

কাজেই কোন ব্যক্তির ভাল নিয়তের কারণে ভাল ফলাফল লাভ করবে আবার খারাপ নিয়তের জন্য মন্দ ফলাফল ভোগ করবে। হাদীসে এসেছে "আল্লাহ তা'য়ালা কোন আমল কবুল করেন না তবে যা তাঁর জন্য নিখুঁতভাবে করা হয় এবং যা দ্বারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করা হয়"। (আবু দাউদ)

রাসূল (সা.) আরও বলেন লোকজনকে তাদের নিয়ত অনুসারে হাশরের ময়দানে উঠানো হবে। (মুসলিম ২৮৭৮)

فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ .... إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ এর ব্যাখ্যা:

আলোচ্য হাদীসের প্রথমাংশে (সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল, প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পায় যা সে নিয়ত করে) এ দু'টি মূলনীতি বর্ণনা করার পর রাসূল (সা.) দু'টি উদাহরণ পেশ করেন। যার প্রথমটি একনিষ্ঠতার এবং দ্বিতীয়টি মন্দের পরিণতির। এ দুটি উদাহরণের মাধ্যমে রাসূল (সা.) বুঝাতে চেয়েছেন সমস্ত আমলের পরিণতি এমনই।

যে ব্যক্তির হিজরতের উদ্দেশ্য থাকবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) এর সন্তুষ্টি তার হিজরত ভাল আমল হিসেবে গণ্য হবে আবার যে ব্যক্তির হিজরতের উদ্দেশ্য থাকবে দুনিয়া পাওয়া তাঁর হিজরত মন্দ আমল হিসেবে গণ্য হবে।

হিজরতের পরিচয়:

হিজরত অর্থ: ত্যাগ করা, জন্মভূমি ত্যাগ করা। পরিভাষায় হিজরত হল: দারুল কুফর বা কুদয়ী ভূখণ্ড ত্যাগ করে দারুল ইসলাম বা ইসলামী ভূখণ্ডে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্য গমন করা। (ফাতহুল মঈন, পৃ-৫২)

হিজরত দুই ধরনের:

১. দৈহিক হিজরত (এক দেশ থেকে অন্য দেশ)

২. অন্তর দ্বারা হিজরত (আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের দিতে হিজরত করা।)

প্রকৃত পক্ষে হিজরত একটি ইবাদত। একটি কুদয়ী দেশ ত্যাগ অথবা শরয়ী নিষিদ্ধ আমল বর্জনের মাধ্যমে হতে পারে।

শিক্ষা:

১. ছোট-বড় সকল কাজে নিয়ত আবশ্যক।

২. সকল বিষয়ের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।

৩. নিয়তের স্থান হল অন্তর, মুখে শব্দবলির মাধ্যমে নিয়ত করা আবশ্যক নয়।

৪. আমলের শুদ্ধতা ও পূর্ণতা নিয়তের উপর নির্ভর করে।

৫. হিজরত ইসলামের একটি মৌলিক ইবাদত।

৬. আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের অন্তর বা নিয়ত ও বাস্তব কর্মের দিকে দৃষ্টিপাত করে থাকেন।

লেখক: প্রভাষক, তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, ঢাকা

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসে কথকতা শ্রমের গুরুত্ব ও শ্রমিকের অধিকার

অধ্যাপক মজিবুর রহমান

পৃথিবীর শুরু থেকে আজ অবধি পৃথিবীর বুকে যা কিছু গড়ে উঠেছে তা সবই শ্রমের ফল এবং শ্রমিকের কৃতিত্ব। ইসলাম শ্রম এবং শ্রমিককে যথার্থ মূল্যায়ন করেছে। একমাত্র ইসলাম ধর্মই শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করতে মূলনীতি ও বিধান প্রবর্তন করেছে। শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কুরআনুল কারিম ও হাদিসে রয়েছে সুস্পষ্ট নির্দেশনা । আবার সৎ ও শক্তিশালী শ্রমিক নিয়োগের ব্যাপারেও ইসলাম করেছে উৎসাহিত।

আল্লাহ তা'আলা সৎ ও শক্তিশালী শ্রমিককে নিয়োগের বিষয়ে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ

"কারণ তোমার মজদুর হিসাবে উত্তম হলো সে ব্যক্তি, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত"। (সুরা ক্বাসাস : আয়াত ২৬)

আবু মুসা আশ'আরী (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিশ্বস্ত খাজাঞ্চি, যাকে কোনো কিছু নির্দেশ করলে সন্তুষ্টচিত্তে তা আদায় করে, সে হলো দাতাদের একজন। (বুখারী : ১৪৩৮, মুসলিম : ১০২৩/৭৯)

জীবিকার মধ্যে ওই জীবিকা উত্তম যা স্বহস্তে উপার্জন করা হয়। 'আয়িশাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ নিজেদের কাজ-কর্ম নিজেরা করতেন। ফলে তাদের শরীর হতে ঘামের গন্ধ বের হতো। সেজন্য তাদের বলা হলো, তোমরা গোসল করে নাও। (বুখারী : ২০৭১)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন 'ওই ব্যক্তিকে দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হয় যে আল্লাহর হক আদায় করে সেই সাথে মনিবের হক আদায় করে'। (বুখারী : ৯৭)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন "তোমাদের কেউ রশি নিয়ে পাহাড়ে গিয়ে তার পিঠে লাকড়ির বোঝা বহন করে নিয়ে আসে অতঃপর তা বিক্রি করে তা দ্বারা প্রয়োজন পূরণ করে, সেটা তার জন্য উত্তম; লোকদের কাছে কিছু চাওয়ার চেয়ে, হয়তো তারা তাকে কিছু দিতেও পারে আবার নাও দিতে পারে"। (বাইহাকী : ৭৭৯৯)

শ্রমিককে সৎ হিসেবে গড়ে তোলা, তাদের অধিকার প্রদান করা, তাদেরকে ভাইয়ের মর্যাদা দেওয়া আল্লাহর আদেশ, রাসূলের সুন্নাহ এবং সাহাবীদের আমল। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন এসব বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছে।

'মে দিবস'-এর পরিবর্তে 'শ্রমিক দিবস' বলা উচিত

ফেব্রুয়ারি দিবস, না ভাষা দিবস? ডিসেম্বর দিবস, না বিজয় দিবস? মার্চ দিবস না স্বাধীনতা দিবস? মে দিবস না শ্রমিক দিবস? কোনটা বললে ভালো লাগবে? মে দিবস এর বদলে শ্রমিক দিবস বলা হলে বিশেষভাবে শ্রমিক সমাজ খুশি হবে, তাদের গুরুত্ব বাড়বে। ১ মে কে 'মে দিবস' বলা হচ্ছে, 'শ্রমিক দিবস' বলা হচ্ছে না।

যদি এ দিবসটি মে দিবস' এর বদলে শ্রমিক দিবস নামে সব দেশে পালিত হতো এবং সবাই মে দিবস (MAY DAY) না বলে শ্রমিক দিবস (LABOUR DAY) বলতো তাহলে নিঃসন্দেহে শ্রমিকের সম্মান, মর্যাদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতো। গ্রাম বাংলার মানুষ শ্রমিক দিবস বললে যা বুঝে, মে দিবস বললে তা বুঝে না। তখন ইতিহাসসহ বলে দিতে হয়। আজকের এই প্রবন্ধে সারা দুনিয়ার শ্রমিক ও মালিককে আহ্বান জানাতে চাই এখন থেকে শ্রমিকের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'মে দিবস'কে 'মে দিবস' এর পরিবর্তে শ্রমিক দিবস বলা হোক। প্রশাসনের প্রতিও আমাদের আহ্বান সরকারিভাবে এ দিবসকে 'শ্রমিক দিবস' বলা হোক। এটা হলে যাদের জন্য দিবস পালন করা হয় তারা তখন নাম দেখেই বুঝতে পারবে।

সকল দিবসই বিষয়ভিত্তিক, শুধুমাত্র শ্রমিক এর ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম। এটা শ্রমিকের প্রতি একটা অবিচার-একটা জুলুম। একটা উদাহরণ দেখা যাক, মে মাসের ৩১ দিনের মধ্যে ২৩ দিনে বিভিন্ন দিবস পালন করা হয়। যা নিচে উল্লেখ করা হলো। সেখানে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় সবগুলো দিবসের সাথেই সংশ্লিষ্ট বিষয় উল্লেখ আছে, বিধায় নামেই বুঝা যায় এটা কি দিবস বা কাদের দিবস। কিন্তু ১ মে কে 'মে দিবস' বললে, কীসের দিবস বা কাদের দিবস তা বুঝা যায় না। তাই ১ মে কে 'শ্রমিক দিবস' বললে, এটা যে শ্রমিকদের দিবস তা সহজেই

বুঝা যায়, কোনো ব্যাখা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না।

অন্যদিকে, মে দিবস বললে মে মাসে পালিত সব দিবসকেই বুঝানো যায়। যুক্তি বলে মে মাসে পালিত ২৩টি দিবসের সব দিবসকেই মে দিবস বলতে হবে। মে মাসে অনুষ্ঠিতব্য সব দিবসকেই মে দিবস বলার অধিকার রয়েছে। তাই শুধুমাত্র '১ মে'-কে 'মে দিবস' বলা ভুল হবে নিঃসন্দেহে। এ ভুল থেকে বাঁচার উপায় হলো '১ মে'-কে 'মে দিবস' বলার পরিবর্তে 'শ্রমিক দিবস' বলা। তাহলে বাংলার খেটে খাওয়া মানুষ, 'শ্রমিক দিবস' বলা মাত্র চিনে নিতে পারবে এটা তাদের দিবস। এতোদিন মে দিবসকে তারা চিনতে পারেনি, এখন থেকে শ্রমিক দিবস, বলা মাত্র চিনে নিতে পারবে।

মে মাসের পালিত দিবস তালিকা :

১ মে : মে দিবস (আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস)

৩ মে : সংবাদপত্র স্বাধীনতা দিবস, বিশ্ব গণমাধ্যম দিবস, বিশ্ব অ্যাজমা দিবস

৪ মে : কয়লা খনি শ্রমিক দিবস

৫ মে : বিশ্ব অ্যাথলেটিকস দিবস, বৃটিশ বিরোধী নেতা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এর জন্মদিবস

৮ মে : বিশ্ব রেড ক্রিসেন্ট দিবস, ২য় বিশ্বযুদ্ধ নিহতদের দিবস, রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী

১০ মে : বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস (World migratory bird day)

১২ মে : আন্তর্জাতিক নার্স দিবস।

১৩ মে : আন্তর্জাতিক ফৌজদারী আদালত দিবস,

১৫ মে : পরিবার দিবস

১৬ মে : ফারাক্কা লংমার্চ দিবস বা ফারাক্কা দিবস

১৭ মে : ওয়ার্ল্ড ইনফরমেশন সোসাইটি ডে, বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবস, উচ্চ রক্তচাপ দিবস

১৮ মে : বিশ্ব জাদুঘর দিবস

১৯ মে : বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস

২০ মে : বিশ্ব পরিমাপবিদ্যা দিবস (World Metrology Day), চা শ্রমিক হত্যা দিবস

২১ মে : বিশ্ব সাংস্কৃতিক বৈচিত্র সংলাপ দিবস

২২ মে : আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র দিবস

২৩ মে : বিশ্ব কচ্ছপ দিবস

২৫ মে : নজরুল জন্মজয়ন্তী (১১ জ্যৈষ্ঠ)

২৮ মে : বিশ্ব নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের মৃত্যু বার্ষিকী

২৯ মে : জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস

৩০ মে : প্রয়াত রাষ্ট্রপতি ও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের মৃত্যু বার্ষিকী

৩১ মে : বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস

এছাড়া মে মাসের প্রথম রবিবার বিশ্ব হাসি দিবস, মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার মা দিবস।

এখানে '১ মে' কে শ্রমিক দিবস নামে অভিহিত করলে অন্যান্য সব দিবসের পদ্ধতিগত মিল পাওয়া যায়।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম এর তথ্যে শ্রমিক দিবস

১. শিকাগো ঘটনার আগে নিউইয়র্ক শহরের ঘটনা-১৮৮২ সালের ৫ সেপ্টেম্বরেও যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ১০ হাজার শ্রমিক তাঁদের অধিকার নিশ্চিতের দাবিতে নিউইয়র্কে শহরে সমাবেশ করেছিল।

২. আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে শ্রমিকদের রক্ত ঝরে-১৮৮৬ সালের ১ মে। যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের শ্রমিকেরা আট ঘণ্টা কর্মদিবসের দাবিতে নিজেদের রক্ত দিয়েছিল। সেই প্রেক্ষাপটেই আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস ১ মে দিবস পালন শুরু হয়।

৩. ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে শ্রমিক দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয়- যুক্তরাষ্ট্রে আন্দোলন ও হতাহতের ঘটনা ১৮৮৬ সালে ঘটলেও শ্রমিক দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয় তিন বছর পরে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে, সেটা ১৮৮৯ সালে অনুষ্ঠিত হয়।

সেদিন যা যা ঘটেছিল

১৮৮৬ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরের 'হে মার্কেটে' দৈনিক আট ঘণ্টার কাজের দাবিতে শ্রমিকরা জমায়েত হয়েছিলো। তাদেরকে ঘিরে থাকা পুলিশের প্রতি এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির বোমা নিক্ষেপের পর পুলিশ শ্রমিকদের ওপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। ফলে ১২ জনের মতো শ্রমিক ও পুলিশ নিহত হয়। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি বিপ্লবের শতবার্ষিকীতে প্যারিসে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে শিকাগো প্রতিবাদের বার্ষিকী আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন দেশে পালনের প্রস্তাব করা হয়। শ্রমিকদের নিয়োগপত্র প্রদান, বেতনভাতা বৃদ্ধি, কল্যাণমূলক সুবিধাদি দান, কর্মঘণ্টা নির্ধারণ, কর্মপরিবেশের উন্নয়ন ও নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নসহ নানা ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়। পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, শ্রমিক আন্দোলন যদি তার নিজস্ব চরিত্র নিয়ে অব্যাহত থাকতো তাহলে শ্রমিকরা এখনকার চেয়ে হয়তো আরও বেশি সুবিধা ও নিরাপত্তা লাভ করতে পারতো।

বাংলাদেশে ১ মে শ্রমিক দিবসে সরকারি ছুটি। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন দিনটি পালন করতে শোভাযাত্রা, শ্রমিক সমাবেশ, আলোচনা সভা, সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ নানা কর্মসূচি নিয়ে থাকে। শ্রমিক দিবসে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক ফেডারেশনসহ বিভিন্ন সংগঠন পৃথক কর্মসূচি পালন করে। তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় ১৯২৭ সালে প্রথম শ্রমিক দিবস পালন করা হয়। দেশ বিভাগের পূর্বে নারায়ণগঞ্জে শ্রমিক দিবস পালিত হয় ১৯৩৮ সালে। আদমজীতে ৩০ হাজার শ্রমিক লাল পতাকা নিয়ে সভা সমাবেশ মিছিলে অংশ নেয়। ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারির পূর্ব পর্যন্ত শ্রমিক দিবস বেশ বড় আকারে সমাবেশের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হতে থাকে।

মুক্ত বিশ্বকোষ এর অভিমত

এটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের একটি দিবস। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শ্রমজীবী মানুষ এবং শ্রমিক সংগঠনসমূহ রাজপথে মিছিল ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে দিবসটি পালন করে থাকে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় একশত দেশে এটি সরকারী ও বেসরকারিভাবে পালিত হয়।

প্রতিবছর মে মাসের ১ তারিখ পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস' বা 'মে দিবস'। শুধুমাত্র আমাদের দেশেই নয়, বিশ্বের বহু দেশে

এই দিন জাতীয় ছুটি থাকে। এই দিনটি শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের দিন। দিনের পর দিন লড়াই এবং বহু সংগ্রাম পেরিয়ে এই দিনটি সারা বিশ্বের শ্রমিকদের কাছে এক গৌরবময় বা উজ্জ্বল দিন। এটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবেও পরিচিত।

শ্রমিকদের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে প্রতিদিন ১৬ ঘণ্টা ধরে কাজ করতে হতো। ১৮৭৭ সালে সমস্ত ন্যায্য মজুরি, আট ঘণ্টা কর্মদিবস ও অন্যান্য দাবিতে শ্রমিকরা ব্যাপক ধর্মঘট পালন করছিল। সরকারের লেলিয়ে দেওয়া পুলিশের গুলিতে ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত ৩০০ শ্রমিক আহত হন। ১৮৮৬ সালের পয়লা মে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে ১১ হাজার ৫৬২টি শিল্পকারখানাসহ সব শিল্পাঞ্চলে আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে ধর্মঘটের ডাক দেয় শ্রমিকরা। শহরের তিন লক্ষাধিক মেহনতি মানুষ কাজ বন্ধ রেখে সংগ্রামের লাল ঝান্ডা হাতে নিয়ে নেমে আসেন রাস্তায়। পুলিশ এর গুলিতে ওই দিনই নিহত হন ১০ জন শ্রমিক, আহত হন হাজার হাজার শ্রমিক। ৩ মে রিপার কারখানার সামনে প্রতিবাদ সভায় পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান আরও ছয়জন শ্রমিক। এসব হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে ৪ মে শিকাগোর 'হে মার্কেট' স্কয়ারে স্মরণাতীত-কালের বিশাল শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এখানে চারজন শ্রমিক ও সাত পুলিশ নিহত হয়। আন্দোলনে অংশ নেয়ার কথিত অপরাধে গ্রেফতার করা হয় বহু শ্রমিককে। গ্রেফতারকৃত ছয়জন শ্রমিককে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

তীব্র আন্দোলনের মুখে পড়ে শ্রমিকদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয় সরকার। এরপর ১৮৮৯ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে ১ মে-কে মে দিবস যা প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস তা পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মে দিবস আসে যায়, পরিবর্তন হয় না শ্রমিকের ভাগ্য

প্রতি বছর আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস ১ মে এর আগমনে সারা দুনিয়ায় শ্রমিক মালিকের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে যায়। অনেক আলোচনা অনেক মিছিল অনেক বক্তব্য অনেক লেখালেখি চলতে থাকে। সরকারি বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এবং নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে বহু ধরনের প্রোগ্রাম, পুরস্কার ওয়াদা পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু দেখা যায় সবকিছুই কথাবার্তার মধ্যে এবং লেখালেখির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সত্য কথা হলো তার অধিকাংশই বাস্তবায়ন করা হয় না। শ্রমিকদের যে অবস্থা সেই অবস্থায়ই থাকতে হয়। তাদের সম্মান ও অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় না। ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয় না। মালিকের সবকিছুই হয় কিন্তু শ্রমিকের ভাগে কিছুই হয় না। বছর বছর এ ধরনের দৃশ্য আমরা দেখে আসছি। অর্থাৎ বক্তাদের কথা ও কাজে মিল নেই। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ
وَأَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ط أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

তোমরা অন্যদের সৎকর্মশীলতার পথ অবলম্বন করতে বলো কিন্তু নিজেদের কথা ভুলে যাও। অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করে থাকো। তোমরা কি জ্ঞান বুদ্ধি একটুও কাজে লাগাও না? (সুরা বাকারা : ৪৪)

আনাস বিন মালেক (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : মিরাজের রাতে আমাকে এমন এক জাতির পাশে নিয়ে আসা হলো যাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দিয়ে কাঁটা হচ্ছে। যখনই কাঁটা শেষ হয় আবার ঠোট পূর্ণ হয়ে যায়। আমি বললাম, তারা কারা হে জিবরীল? তিনি বললেন, তারা হলেন আপনার উম্মতের বক্তাগণ যারা বলতো কিন্তু তা করতো না, তারা কিতাব পড়তো কিন্তু আমল করতো না। (মুসনাদে আহমাদ : ১২২১১)

আজকের এই লেখা থেকে যদি শ্রমিক নেতৃবৃন্দ, মালিক ও মালিকপক্ষ তাদের অবস্থা পরিবর্তন করে তাহলে লেখাটি সার্থক হবে।

জালেম ও মজলুম

পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জুলুমের ব্যাপারে মানবজাতিকে সতর্ক করেছেন। কুরআনের ভাষায়, 'অচিরেই জালিমরা জানতে পারবে, তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল কোথায় হবে।' (সুরা শুআরা : ২২৭)

'জালিমরা কখনো সফলকাম হয় না।' (সুরা : আনআম : ৫৭)

'জল ও স্থলভাগে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে তা মানুষের কর্মের ফলস্বরূপ।' (সুরা রুম : ৪১)

জুলুমের পরিণাম খুবই ভয়াবহ। জুলুম এমন একটি অন্যায় কাজ, যার শাস্তি আল্লাহ তাআলা ইহকালেও দিয়ে থাকেন। জালিমের বিচার শুধু কিয়ামতের দিবসেই হবে না, বরং দুনিয়া থেকেই আল্লাহ তাআলা তাদের জুলুমের প্রতিদান দেওয়া শুরু করেন।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'দুটি পাপের শাস্তি আল্লাহ তাআলা আখিরাতের পাশাপাশি দুনিয়ায়ও দিয়ে থাকেন। তা হলো, জুলুম ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শাস্তি।' (তিরমিযি : ২৫১১)

মজলুমের দোয়া কখনো ব্যর্থ হয় না। তাই মজলুমের অশ্রু ফোঁটা ও অন্তরের অভিশাপ পতনের অন্যতম কারণ। মজলুমের আর্তনাদের ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে জালিমদের ওপর নেমে আসে কঠিন আজাব। তাদের অধঃপতন ত্বরান্বিত হয়। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 'তিন ব্যক্তির দুআ আল্লাহর কাছ থেকে ফেরত আসে না।

এক. ইফতারের সময় রোজাদারের দু'আ।

দুই. ন্যায়পরায়ণ শাসকের দোয়া।

তিন. মজলুমের দু'আ। আল্লাহ তাআলা তাদের দু'আ মেঘমালার ওপরে তুলে নেন এবং তার জন্য আসমানের দরজাগুলো খুলে দেন।

রাসূল (সা.) আরও বলেন, 'তোমরা মজলুমের দোয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকো। কেননা মহান আল্লাহ ও তার দোয়ার মাঝে কোনো পর্দা থাকে না। (বুখারি, হাদিস : ১৪৯৬)

সুতরাং মালিক যেন শ্রমিকের প্রতি কোনোভাবেই জুলুম না করে আর শ্রমিক যাতে মজলুম না হয়, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

শ্রমিকের পক্ষে আল্লাহ অভিযোগ পেশ করবেন

যে ব্যক্তি শ্রমিক দিয়ে কাজ করানোর পর, পাওনা পরিশোধ করে না তার বিরুদ্ধে আখেরাতে মামলা হবে। এ প্রসঙ্গে হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেছেন, 'কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণির মানুষের ব্যাপারে আমি নিজে অভিযোগ উত্থাপন করব-এক. যে ব্যক্তি আমার নামে অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গ করেছে। দুই. যে ব্যক্তি কোনো স্বাধীন মানুষকে বিক্রি করে মূল্য ভোগ করেছে। তিন. যে ব্যক্তি শ্রমিক দিয়ে কাজ করানোর পর, পাওনা পরিশোধ করেনি।'

(সুনানে সুগরা লিল বাইহাকি : ২/১৪০)

পারিশ্রমিক প্রদানে আবশ্যকীয় বিষয়

শ্রমিকের পারিশ্রমিক প্রদানে মালিকের কয়েকটি আবশ্যকীয় বিষয় রয়েছে। সেগুলো হলো-

এক. শ্রমিককে সময়মতো তার পারিশ্রমিক প্রদান করবে, পারিশ্রমিক দিতে বিলম্ব করবে না। যে সকল শ্রমিক নিয়মিত কাজ করে এবং তাদের বেতন মাস হিসেবে নির্দিষ্ট করা; মাস শেষ হওয়া মাত্রই তাদের বেতন দিয়ে দিতে হবে। আর যে সকল শ্রমিক নিয়মিত নয়, দিন হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত- তাদের দিন শেষ হওয়া মাত্রই বেতন দিয়ে দিতে হবে। এক কথায়, কাজ হিসেবে শ্রমিককে কাজে লাগালে কাজ শেষ হওয়া মাত্রই নির্ধারিত বেতন দিতে হবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন, 'শ্রমিকের ঘাম শুকানোর পূর্বে তার মজুরি পরিশোধ করো। (ইবনে মাজাহ : ৩/৯৭)

দুই. শ্রমিকের পারিশ্রমিক প্রদানে মালিকের দ্বিতীয় যে বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে, সেটা হলো- চুক্তিমতো পারিশ্রমিক প্রদান। পূর্ব নির্ধারিত পারিশ্রমিকের চেয়ে কম দিবে না। বড়ো বড়ো শিল্প প্রতিষ্ঠান, কলকারখানাগুলোতে অনেক সময় দেখা যায়, মালিক পক্ষের কর্মকর্তারা অসহায় গরিব শ্রমিকদের ওপর জুলুম করে। কোনো শ্রমিক কোনো কারণে উপস্থিত হতে পাঁচ-দশ মিনিট বিলম্ব করলে তার হাজিরা কেটে দেয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেতন কেটে নেয়। এটা শ্রমিকের পেটে লাথি মারার মতো কাজ। সারাদিন কাজ করার পরও মাস শেষে সে দিনের বেতন তাকে দেওয়া হয় না। এটা অমানবিক নীতি। ইসলাম এটা সমর্থন করে না।

প্রায়ই দেখা যায়, ঈদের আগে পোশাক খাতের শ্রমিকরা রাজ পথে এসে আন্দোলন করে। ঈদের পূর্বেই বেতন-বোনাস পরিশোধের দাবি করে। ব্যাপারটি মালিকদের জন্য অত্যন্ত লজ্জার। মুসলিম মালিকদের জন্য আরও বেশি লজ্জার। যে গরিব মানুষগুলো নিজেদের পরিশ্রমে মালিকের সম্পদ বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে, তার নিত্যদিনের প্রয়োজন এমনকি বিলাসিতার যোগান দিচ্ছে; ঈদের আগে নিজেদের সামান্য বেতন ও বোনাসের কয়টা টাকার জন্য তাদেরকে কেন রাস্তায় নামতে হবে?

তিন : ভুল-ত্রুটির জন্য মালিকের পক্ষ থেকে ক্ষমা পাওয়াও শ্রমিকের অধিকার। শ্রমিক ভুল করলে মালিক সেটা ক্ষমা করবে, যদিও তা দিনে সত্তর বার করতে হয়।

এক ব্যক্তি এসে হজরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, কর্মচারীকে কতবার ক্ষমা করব? রাসূল (সা.) কোনো উত্তর দিলেন না। নীরব থাকলেন। সে আবারও জিজ্ঞাসা করল। তিনি এবারও কোনো উত্তর দিলেন না। তৃতীয় বার জিজ্ঞাসা করার পর উত্তরে বললেন, "প্রতিদিন সত্তর বার ক্ষমা করবে"। (সুনানে আবু দাউদ : ৫১৬৬)

বর্তমানে কল-কারখানার শ্রমিকদের মারধর করা না হলেও অনেক সুপারভাইজার শ্রমিকদের অকথ্য ভাষায়, অভদ্র ভাষায় গালাগালি করে। আবার বাসা-বাড়ির কাজের মেয়েদের ওপর দৈহিক নির্যাতন করা হয়। কিছু থেকে কিছু হলে মারধর করা হয়। শ্রমিকের ভুল-ত্রুটির জন্য তাকে মারধর করা, দৈহিক কষ্ট দেওয়া তো দূরের কথা, তাকে গালি দিতে বা কটু কথা বলতেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

“প্রায়ই দেখা যায়, ঈদের আগে পোশাক খাতের শ্রমিকরা রাজ পথে এসে আন্দোলন করে। ঈদের পূর্বেই বেতন-বোনাস পরিশোধের দাবি করে। ব্যাপারটি মালিকদের জন্য অত্যন্ত লজ্জার। মুসলিম মালিকদের জন্য আরও বেশি লজ্জার। যে গরিব মানুষগুলো নিজেদের পরিশ্রমে মালিকের সম্পদ বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে, তার নিত্যদিনের প্রয়োজন এমনকি বিলাসিতার যোগান দিচ্ছে; ঈদের আগে নিজেদের সামান্য বেতন ও বোনাসের কয়টা টাকার জন্য তাদেরকে কেন রাস্তায় নামতে হবে?”

একদা হজরত আবু যর (রা.) তার এক ক্রীতদাসকে বকা দিলে সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ দিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কঠোর ভাষায় সতর্ক করে বললেন, "হে আবু যর! এখনও তোমার মাঝে জাহেলিয়্যাত বাকি আছে। সে তোমার ভাইয়ের মতো। তবে আল্লাহ তোমাকে তার ওপর সম্মানিত করেছেন। তাকে তোমার ভালো না লাগলে তুমি তাকে অন্যত্র বিক্রি করে দাও। আল্লাহর সৃষ্টিকে কষ্ট দিও না"।

(সুনানে আবু দাউদ : ৫১৫৯)

মালিক-শ্রমিকের খাওয়া-পরার মান একই হওয়া উচিত

যে শ্রমিকের খাওয়া-পরা মালিকের দায়িত্বে সে শ্রমিকের খাওয়া-পরার ব্যাপারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুস্পষ্ট নির্দেশ হলো- 'তোমরা যা খাবে তাদেরকেও তা খেতে দিবে। তোমরা যা পরবে তাদেরও তা পরতে দিবে।' (সুনানে আবু দাউদ : ৫১৬৩)

সাধারণত বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের খাওয়া-পরা মালিকের দায়িত্বে থাকে না। কিন্তু বাসা-বাড়ি, দোকান, ক্ষেত-খামার এবং ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের খাওয়া বা খাওয়া-পরা উভয়টা মালিকের দায়িত্বে থাকে। এক্ষেত্রে একজন ঈমানদার মালিক- যে আল্লাহ, নবী ও পরকালকে বিশ্বাস করে; সে নিজের পরিবারের জন্য রান্নার এক তালিকা আর শ্রমিকদের জন্য রান্নার আরেক তালিকা করতে পারে না। যে খাবার মালিক নিজে খাবে, নিজের পরিবারের সদস্যদের খাওয়াবে, সেই খাবারই দোকানের কর্মচারীকে, ক্ষেতের মজুরকে, প্রাইভেট গাড়ির ড্রাইভারকে, বাসার দারোয়ানকে, কাজের মেয়েকে খেতে দিতে হবে। বাসার কাজের মেয়েকে জামা দেওয়ার সময় হুবহু ওই জামা দিতে হবে, যে জামা মালিক কিংবা তার নিজের মেয়েরা পরিধান করে। বাসার কাজের বুয়াকে শাড়ি দেওয়ার সময় হুবহু ওই শাড়ি কিনে দিতে হবে, যে শাড়ি মালিক নিজের স্ত্রীকে কিনে দেয়। প্রাইভেট গাড়ির ড্রাইভার, বাসার দারেয়ান, দোকানের কর্মচারী, কারখানার শ্রমিককে শার্ট-প্যান্ট দেওয়ার সময় হুবহু তা-ই দিতে হবে, যা মালিক নিজে ব্যবহার করে।

মনে রাখতে হবে, এটা রাসূলের নির্দেশ। এটা সাহাবাদের জীবনাদর্শ। নিজে গোশত দিয়ে ভাত খেয়ে কর্মচারী ও ড্রাইভারদের শাক-ভর্তা খেতে দিয়ে, নিজে গরম ভাত খেয়ে বাসার কাজের মেয়েকে ঠান্ডা-বাসি ভাত খেতে দিয়ে, তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে, আর হজ্ব করে ধার্মিক হওয়া যাবে না। নিজের মেয়েকে দু'হাজার টাকা মূল্যের জামা কিনে দিয়ে আর কাজের মেয়েকে অল্প মূল্যের জামা কিনে দিয়ে রাসূলের সুন্নতের অনুসারী হওয়া যায় না।

শ্রমিককে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ দেওয়া যাবে না। যদি দিতেই হয়ে তবে মালিক নিজে তার কাজে সহযোগিতা করবে।

(সুনানে আবু দাউদ : ৫১৬০)

শ্রমিকের দায়িত্ব

ইসলাম মালিকদের ওপর যেমন দায়িত্ব অর্পণ করেছে, সেরূপ শ্রমিকের ওপরও আরওপ করেছে কিছু দায়িত্ব, যা পালন করা শ্রমিকের জন্য একান্ত আবশ্যক। সেগুলো হলো-

■ **আমানতদারিতা :** শ্রমিকের ওপর অর্পিত দায়িত্ব অবশ্যই আমানতদারিতার সাথে সম্পন্ন করতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'সর্বোত্তম শ্রমিক সেই ব্যক্তি, যে শক্তিশালী ও আমানতদার (দায়িত্বশীল) হয়।' (সুরা কাসাস : ২৬)।

■ **সংশ্লিষ্ট কাজের দক্ষতা ও যোগ্যতা :** দায়িত্বপ্রাপ্ত কাজের জ্ঞান, যোগ্যতা ও দক্ষতা তার থাকতে হবে। শারীরিক ও জ্ঞানগত উভয় দিক থেকেই তাকে কর্মক্ষম হতে হবে।

■ **কাজে গাফিলতি না করা :** ইসলাম কাজে গাফিলতিকে কোনো মতেই সমর্থন করে না। আল্লাহ বলেন, 'দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়, যারা লোকের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে, আর যখন তাদের জন্য মেপে অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়।' (সুরা মোতাফফিফিন : ১-৩)।

আয়াতের অর্থ হলো, নিজে নেয়ার সময় কড়ায়গণ্ডায় আদায় করে নেয়। কিন্তু অন্যকে মেপে দিতে গেলে কম দেয়। ফকিহদের মতে, এখানে তাওফিফ বা মাপে কম-বেশি করার অর্থ হলো, পারিশ্রমিক পুরোপুরি আদায় করে নিয়েও কাজে গাফিলতি করা। অর্থাৎ আয়াতে ওই সব শ্রমিকও শামিল যারা মজুরি নিতে কমতি না করলেও কাজে গাফিলতি করে; কাজে ফাঁকি দেয় তাদেরকে কঠোর শাস্তির হুমকি দেওয়া হয়েছে।

■ **নিজের কাজ মনে করে কাজ করা :** কাজে নিয়োগ পাওয়ার পর শ্রমিক কাজকে নিজের মনে করে সম্পন্ন করবে। অর্থাৎ পূর্ণ দায়িত্বশীলতার সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজটি সম্পাদন করে দেওয়া তার দায়িত্ব হয়ে যায়।

■ **আখেরাতের সফলতার জন্য কাজ করা :** একজন শ্রমিক তার শ্রমের মাধ্যমে যে অর্থ উপার্জন করবে, তা যেন হালাল হয় এবং এর বিনিময়ে পরকালীন সফলতা লাভে ধন্য হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। সেবার মানসিকতা নিয়ে পরম আগ্রহ ও আনন্দের সাথে কাজটি সম্পন্ন করাই হবে শ্রমিকের নৈতিক দায়িত্ব।

শ্রমের গুরুত্ব ও শ্রমিকের মর্যাদা

ইসলাম শ্রমিকদের যে মর্যাদা দেয় পৃথিবীর যেকোনো ইতিহাসের যেকোনো অধ্যায়ের সমাজ ব্যবস্থায় তা নজিরবিহীন। শ্রমিকের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় কুরআনুল কারিম ও হাদিসে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। শ্রমের গুরুত্ব সম্পর্কে পবিত্র কুরআন মাজিদে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَ ابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَ اذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

'অতঃপর নামাজ সমাপ্ত হলে জীবিকার্জনের জন্য তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।' (সুরা জুমআ : ১০)।

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে-

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ

'নিশ্চয়ই আমি মানুষকে শ্রমনির্ভররূপে সৃষ্টি করেছি।' (সুরা বালাদ : ৪)। পৃথিবীর সর্ব প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী আদমই (আ.) থেকে শুরু করে বহু নবী-রাসূল এমনকি সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহও (সা.) শ্রমজীবী ছিলেন। নবী-রাসূল এবং সাহাবায়ে কেরাম নিজ হাতে কাজ করে জীবিকা উপার্জন করেছেন। আমাদের প্রথম নবী আদম (আ.) ছিলেন দুনিয়ার প্রথম চাষি, শুয়াইব (আ.) ও হারুন

(আ.)-এর পেশা ছিল পশু পালন ও দুধ বিক্রি। মুসা (আ.) ছিলেন একজন রাখাল, লুত ও হজরত শিস (আ.) ছিলেন কৃষক, ইদরিস (আ.) ছিলেন দর্জি, নুহ (আ.) ছিলেন কাঠমিস্ত্রি, ইবরাহিম (আ.), ইয়াকুব (আ.), হুদ (আ.) সালেহ (আ.) ছিলেন ব্যবসায়ী। এছাড়াও ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর (রা.) এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন সৎ ব্যবসায়ী।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- আল্লাহ দুনিয়াতে এমন কোন নবী পাঠাননি যিনি ছাগল ও ভেড়া চড়াননি। তখন সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, হে রাসূল (সা.) আপনিও? রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, হ্যাঁ! আমিও মজুরীর বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল ও ভেড়া চরাতাম। (বুখারি : ১৩৪০)।

হজরত আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন- 'অধীনস্থদের সাথে দুর্ব্যবহারকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' (তিরমিজি)। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম শ্রমজীবীদের সম্পর্কে বলেছেন, 'আপন সন্তান-সন্ততির মতো তাদের মানসম্মানের সাথে তত্ত্বাবধান করো আর তাদের খেতে দেবে, যা তোমরা নিজেরা খেয়ে থাকো।' (মিশকাত, ইবনে মাজাহ)।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম ও শ্রমিক

আনাস (রা.) আরও বলেন, আমি নবী করীম (সা.)-এর এখানে দশ বছর ধরে খেটেছি তার খেদমত করেছি কিন্তু তিনি কোন দিন আমাকে ভৎসনা করেননি। কোন দিন বলেননি এটা এভাবে কেন করছ ওটা ঐভাবে কেন করনি। (আল আদাবুল মুফরাদ)

নবী করিম (সা.) তাদের মানসিক অবস্থার দিকেও খেয়াল রাখতেন। প্রখ্যাত সাহাবী আবু যর গিফারী (রা.) নবী করিম (সা.) এর খেদমতগার ছিলেন। একদিন কাজের চাপ কিছু বেশী হওয়ায় খানিকটা রাত করেই তিনি মসজিদে নববীর এক কোনায় শুতে গেলেন। ঐ দিন তিনি একটু বেশী পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই নবী করীম (সা.) তাকে আংগুলির ইশারায় জাগালেন আর একান্ত সহানুভূতিশীল কণ্ঠে জিজ্ঞেস কররেন-আবু যর? ঐ দিন তুমি কি করবে যে দিন তোমাকে এই মসজিদ থেকে বের করে দেওয়া হবে?

নবী করিম তখন হাত উঠালেন দু'আ করলেন, আল্লাহ আবু যরকে তুমি ক্ষমা করে দিও। আর কিছু নসীহতমূলক কথা বলে তিনি উঠে আসলেন। হুজুরে পাক (সা.) এই দু'আয় আবু যরের শ্রান্ত মন যে কতটা শান্ত হয়ে উঠেছিল তা আর বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না।

নবী করিম (সা.) ইরশাদ করেছেন, মজুরকে তার কাজ হতে অংশ দান করো। কারন মজুরকে বঞ্চিত করা যেতে পারে না।

নবী করিম (সা.) বলেন, তোমার ভৃত্য যদি তোমার অন্ন প্রস্তুত করে এবং তা নিয়ে তোমার নিকট আসে যা রান্না করার সময় আগুনের তাপ এবং ধুম্র তাপে অনেক কষ্ট দিয়েছে তখন তাকে তোমার সঙ্গে বসিয়ে খাইয়ে দেবে। খানা যদি শুষ্ক হয়ে থাকে তবে তা হতে তার হাতে এক মুষ্ঠি বা দুই মুষ্ঠি খাবার তুলে দিবে।

মালিক শ্রমিকদের খোঁজ নিবে

আজকের এই সমাজে যদি কোনো মালিক শ্রমিকদের খোঁজ খবর নিজ থেকে নেয় সুখে দুঃখে সান্তনার বাণী নিয়ে আসে তবে অতি সহজেই সব কিছুর সমাধান হয়ে যেতে পারতো। নবী করিম (সা.) এর নির্দেশাবলি সাহাবা কেরাম তথা মুমিনদের জীবনে অত্যন্ত আশ্চর্য

পৃথিবীর সর্ব প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী আদম (আ.) থেকে শুরু করে বহু নবী-রাসূল এমনকি সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহও (সা.) শ্রমজীবী ছিলেন। নবী-রাসূল এবং সাহাবায়ে কেরাম নিজ হাতে কাজ করে জীবিকা উপার্জন করেছেন। আমাদের প্রথম নবী আদম (আ.) ছিলেন দুনিয়ার প্রথম চাষি, শুয়াইব (আ.) ও হারুন (আ.)-এর পেশা ছিল পশু পালন ও দুধ বিক্রি। মুসা (আ.) ছিলেন একজন রাখাল, লুত ও হজরত শিস (আ.) ছিলেন কৃষক, ইদরিস (আ.) ছিলেন দর্জি, নুহ (আ.) ছিলেন কাঠমিস্ত্রি, ইবরাহিম (আ.), ইয়াকুব (আ.), হুদ (আ.) সালেহ (আ.) ছিলেন ব্যবসায়ী। এছাড়াও ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর (রা.) এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন সৎ ব্যবসায়ী।

> **“হযরত উমর (রা.) একবার বলেছিলেন আল্লাহ ঐ জাতিকে লানত করেন, যারা নিজেদের খাদেমদের নিয়ে এক সঙ্গে খেতে ঘৃণা বোধ করে।**
> **এ কথা শুনে সাফওয়ান (রা.) বলে উঠলেন “খোদার কসম আমরা এ ঘৃণাবোধ করি না। অধিকন্তু নিজেদের উপর আমরা তাদেরকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি।”**
> **(আল আদাবুল মুফরাদ)**

রকমের প্রভাব সৃষ্টি করেছিলো এবং শ্রমিক মালিকের মধ্যে অতুলনীয় হৃদ্যতার সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলো।

আবু যর (রা.) যখন বেরুতেন লোকেরা দেখতো, তিনি যে রকমের কাপড় পরে আছেন তেমনি ধরনের কাপড় খাদেমের অঙ্গেও শোভা পাচ্ছে। অনেকে বলত হযরত যে কাপড়টি তাকে দিয়েছেন এটি যদি আপনিই পরে নিতেন তবে আপনার পোশাকটা পরিপূর্ণ হয়ে যেতো। তিনি বলতেন, ঠিকই বলেছ, কিন্তু আমি নবী করিম (সা.)-এর কাছে শুনেছি তিনি বলেছেন- যারা তোমাদের কাজ করছে তারা তোমাদের ভাই। যা নিজে পরবে তাই তাদের পরাবে যা খাবে তাই তাদেরকে খাওয়াবে। (আহমদ আর আদাবুল মুফরাদ)

আবু হুরাইরা (রা.) তাঁর খাদেমের জন্য গোশত তৈরি করে রেখে বসে থাকতেন। সে বাজার থেকে আসলে তাকে সঙ্গে নিয়ে খেতেন। লোকেরা তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে বলেছিলেন আমি আমার দিল সাফ বানাবার জন্য এমন করি। (আল আদাবুল মুফরাদ)

“হযরত উমর (রা.) একবার বলেছিলেন আল্লাহ ঐ জাতিকে লানত করেন, যারা নিজেদের খাদেমদের নিয়ে এক সঙ্গে খেতে ঘৃণা বোধ করে।

এ কথা শুনে সাফওয়ান (রা.) বলে উঠলেন “খোদার কসম আমরা এ ঘৃণাবোধ করি না। অধিকন্তু নিজেদের উপর আমরা তাদেরকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি।” (আল আদাবুল মুফরাদ)

আমেরিকা ও কানাডাতে মে দিবস পালিত হয় না

বিশ্বের ৯০টি দেশে সরকারিভাবে মে মাসের প্রথম দিনটিকে মে দিবস নামে তথা আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে। যে দেশে ঘটনার জন্ম, সেই দেশ অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রে দিনটি সরকারিভাবে পালিত হয় না। ১ মে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের শ্রমিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসের উৎপত্তি হলেও যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিক দিবস মে মাসে পালিত হয় না, এটা সেখানে পালিত হয় সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সোমবার।

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সোমবার আমেরিকা মে দিবস নয়, শ্রমিক দিবস পালন করে বেসরকারিভাবে। এ ছাড়া তাদের প্রতিবেশী দেশ কানাডায় দিবসটি সরকারিভাবে পালন করা হয় না। তবে বেসরকারিভাবে কিছু শ্রমিক সংগঠন দিনটি পালন করতে শোভাযাত্রা ও র‍্যালি বের করে। আমেরিকা ও কানাডাতে সেপ্টেম্বর মাসে শ্রম দিবস পালিত হয়। সেখানকার কেন্দ্রীয় শ্রমিক ইউনিয়ন এবং শ্রমের নাইট এই দিন পালনের উদ্যোক্তা। হে মার্কেটের হত্যাকান্ডের পর আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট গ্লোভার ক্লিভল্যান্ড মনে করেছিলেন পয়লা মে তারিখে যে কোনো আয়োজন হানাহানিতে পর্যবসিত হতে পারে।

দেশে দেশে শ্রমিক দিবস পালিত

বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্তত ৮০টি দেশে এই দিন জাতীয়ভাবে ছুটি থাকে। এদিন বেশির ভাগ দেশে শ্রমিকদের শোভাযাত্রা, আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি হয়। তবে যে দেশে শ্রমিক হত্যা ঘটেছিল, সেই আমেরিকা সরকারিভাবে ‘লেবার ডে’ পালন করে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সোমবার। কানাডাতেও একই দিনে ‘লেবার ডে’ পালন করা হয়। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ১ মে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, চীন, জাপান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, ইরাক, ফিলিপাইন, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর হন্ডুরাস, প্যারাগুয়ে ও পেরু ইত্যাদি দেশে এ দিনে সরকারিভাবে ছুটি থাকে। মেক্সিকোতেও দিনটি ফেডারেল হলিডে বা সরকারি ছুটির দিন হিসেবে পালিত হয়। বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে মে দিবসকে জাতীয় দিবস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে এবং মহান শ্রমিক দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করে। আর্জেন্টিনায় ১৮৯০ সালে বিশ্বের সর্বপ্রথম ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবে পালিত হয়। ১৯৩০ সালে সরকারিভাবে ছুটি ঘোষণা করা হয়।

লেখক: সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বিশ্ব নবীর পরিবারে তিনজন গোলাম

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

গত সংখ্যার পর....

হযরত যায়েদ (রা.)

আবু উসামা যায়িদ নাম। পিতা হারিসা এবং সুদা বিনতু সালাবা। রাসূলুল্লাহ (সা.) যায়েদকে খুব ভালোবাসতেন এজন্য তার উপাধি হয় 'হিব্বু রাসূলুল্লাহ' অর্থাৎ রাসূলুল্লাহর প্রিয় ব্যক্তি।

সুদা বিনতু মালাকা তার শিশুপুত্র যায়িদকে সঙ্গে করে পিতৃ গোত্র বনী মানের নিকট যাওয়ার পথে রাতের বেলা বনী কায়েনের লুটের দল তাবুতে আক্রমণ করে ধন সম্পদ, উট ইত্যাদি লুণ্ঠন করে এবং শিশুদের বন্দী করে নিয়ে যায়। এ বন্দী শিশুদের মধ্যে হযরত যায়িদও ছিলেন। যায়িদের বয়স তখন ৮ বছর। উকাজ মেলায় তাকে চারশত দিরহামে বিক্রি করা হয়। হাকিম ইবনে হিজাম তাকে খরিদ করে মক্কায় নিয়ে আসেন। তিনি তার ফুফু খাদিজা (রা.) কে হাদিয়া হিসাবে যায়িদকে দান করেন। হযরত খাদিজার সাথে নবী করিম (সা.) বিবাহ হলে তিনি যায়িদকে গোলাম হিসাবে নবী করিম (সা.) কে দান করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘরে লালিত পালিত হন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) নিকট সকল কাজের প্রশিক্ষণ লাভ করেন ওহীর জ্ঞানের ছাঁয়ায়। যায়েদ (রা.) এর পিতা সন্তানকে খুঁজতে থাকেন। পরিচিত অপরিচিত প্রতিটি মানুষের নিকট ছেলের সন্ধান জানতে চান। হজ্বের মৌসুমে যায়িদের গোত্রের কতিপয় লোক হজ্ব করতে আসে এবং যায়িদের সাথে পরিচয় ও কথা হয়। তারা হজ্ব থেকে ফিরে যায়িদের পিতাকে হারানো ছেলের সন্ধান দেন। তার পিতা টাকা পয়সা নিয়ে আসেন যায়িদকে মুক্ত করার জন্য। রাসূলুল্লাহর (সা.) নিকট যায়িদের মুক্তির জন্য কত টাকা চান প্রস্তাব দিলে তিনি বলেন, মুক্তিপনের চেয়ে উত্তম কিছু আপনাদের জন্য পেশ করি। তা কি আপনারা চান? তারা বললেন, অবশ্যই। হুজুর (সা.) যায়িদকে ডাকলেন এবং বললেন, এ দু'ব্যক্তি কারা? সে বলল আমার পিতা এবং আমার চাচা কাব। তুমি ইচ্ছা করলে আমার সাথেও থেকে যেতে পারো বা তাদের সাথে চলে যেতে পারো। কোনো রকম ইতঃস্তত না করে সঙ্গে সঙ্গে যায়িদ বলে উঠল, আমি আপনার সাথেই থাকব। তার পিতা বললেন, তুমি পিতা-মাতা ছেড়ে দাসত্ব বেছে নিলে? তিনি বললেন, এ ব্যক্তির মাঝে আমি এমন কিছু দেখেছি যার কারণে আমি কখনও তাকে ছেড়ে যেতে পারি না। আল্লাহর রাসূল যায়িদকে হাত ধরে কাবার সামনে উপস্থিত হয়ে ঘোষণা করলেন যে, আজ থেকে যায়িদ আমার ছেলে। সে হবে আমার এবং আমি হব তার উত্তরাধিকারী। ঘোষণায় যায়িদের পিতা-চাচা খুব খুশি হলো। অবশ্য পরে কুরআনে মুখ ডাকা ছেলে বাতিল ঘোষণা করা হয়।

বিশেষ করে মুহাম্মদ (সা.) যখন থেকে মক্কাবাসীর শিরক, কুফর ও ধর্মের মূল কেন্দ্রে চরম অধর্ম এবং গোটা আরবজাতি গোত্র পরম্পরায়, খুন খারাবী, লুটতরাজ ও হিংসা বিদ্বেষে নিমজ্জিত ছিল, তখন হেরা গুহায় সত্যের সন্ধানে বিশেষ ধ্যানে নিজেকে নিয়োজিত করেন তখন থেকে যায়িদ (রা.) পর্বত গুহায় তার সার্বিক সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন এবং আল্লাহর রাসূল (সা.) অত্যন্ত স্নেহ, ভালবাসা দিয়ে তাকে কাছে রাখেন। হেরা গুহায় মুহাম্মদ (সা.) সপ্তাহভর কাটাতে লাগলেন তখন যায়েদ (রা.) সেখানে খাওয়া-দাওয়া ও পানীয় পৌঁছাতেন। কখনও রাসূল (সা.) এর অজান্তে গুহায় প্রবেশ পথে রাতজেগে মরুভূমির জীবজন্তু থেকে রক্ষার্থে পাহাড়া দিতেন। বারাকা মায়ের মর্যাদায় এবং যায়েদ সন্তানের অধিকারের মর্যাদায় মুহাম্মদ (সা.) ও খাদিজার সংসারে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এভাবে কিছুদিন অতিক্রম করার পর মহান আল্লাহ তার প্রতি অহী নাজিল করেন হেরা গুহায়। আল্লাহর রাসূল (সা.) রেসালাতের নতুন অভিজ্ঞতায় হেরা গুহা হতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ঘরে ফেরার পথে যায়েদ (রা.)-এর প্রতি রাসূল (সা.) এর সঙ্গী হয়ে রেসালাতের বিবরণ শোনেন রাসূল (সা.) এর ঘরের তিনজন বারাকা, খাদিজা ও যায়েদ এমনভাবে ঈমান আনে যে কে কার আগে ঈমান এনেছিল তা বলা মুশকিল।

রাসূল (সা.) যায়েদ (রা.) ভালোবাসার দৃষ্টান্ত হিসাবে মক্কার কুরাইশ বংশে অভিজাত ঘরের মেয়ে নবী করিম (সা.) এর ফুফাত বোন যয়নব (রা.) কে গোলাম যায়েদের সাথে বিয়ে দিয়ে বংশ মর্যাদার দেওয়াল ভেঙে চুরমার করে প্রমান করে দিলেন যে গোলাম আর মালিকের মর্যাদা সমান। দুনিয়ার সকল মানুষ আদমের সন্তান, সকল মানুষ

রাসূল (সা.) যায়েদ (রা.) ভালোবাসার দৃষ্টান্ত হিসাবে মক্কার কুরাইশ বংশে অভিজাত ঘরের মেয়ে নবী করিম (সা.) এর ফুফাত বোন যয়নব (রা.) কে গোলাম যায়েদের সাথে বিয়ে দিয়ে বংশ মর্যাদার দেওয়াল ভেঙে চুরমার করে প্রমান করে দিলেন যে গোলাম আর মালিকের মর্যাদা সমান। দুনিয়ার সকল মানুষ আদমের সন্তান, সকল মানুষ আল্লাহর গোলাম, মানুষ মানুষের গোলাম হতে পারেনা। সকল মানুষ এক, সকলে ভাই ভাই। যয়নব (রা.) যায়েদ (রা.) এর সাথে দ্বিমত পোষণ করায় আল্লাহর রাসূল (সা.) যায়েদ (রা.) সম্পর্কে বলেন, শোনো যয়নব (রা.) যায়েদ কুরাইশী বংশের না হলেও সে মহান চরিত্রের অধিকারী। প্রশস্ত আত্মার মালিক এবং প্রথম ঈমান গ্রহণকারী, যাকে বেহেস্তী হওয়ার সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে, ইসলাম কোনো জাত বিভেদ নেই, ইসলাম সব মানুষকে সমান করে দেয়।

আল্লাহর গোলাম, মানুষ মানুষের গোলাম হতে পারেনা। সকল মানুষ এক, সকলে ভাই ভাই। যয়নব (রা.) যায়েদ (রা.) এর সাথে দ্বিমত পোষণ করায় আল্লাহর রাসূল (সা.) যায়েদ (রা.) সম্পর্কে বলেন, শোনো যয়নব (রা.) যায়েদ কুরাইশী বংশের না হলেও সে মহান চরিত্রের অধিকারী। প্রশস্ত আত্মার মালিক এবং প্রথম ঈমান গ্রহণকারী, যাকে বেহেস্তী হওয়ার সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে, ইসলামে কোনো জাত বিভেদ নেই, ইসলাম সব মানুষকে সমান করে দেয়।

নবী করিম (সা.) তায়েফ হিজরতকালে একমাত্র সঙ্গী ছিলেন হযরত যায়েদ (রা.) তিনি পায়ে হেঁটে তায়েফ গমন করেন। তায়েফে রাসূল (সা.) এর উপর বৃষ্টির মতো পাথর বর্ষণ করা হয়। যায়েদ (রা.) নিজ জীবনের পরওয়া না করে নিজের পিঠ পেতে নিক্ষিপ্ত পাথরের আঘাত সহ্য করে নবী করিম (সা.) কে রক্ষা করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। নবী করিম (সা.) পাথরের আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে পরে যান, নবী করিম (সা.) কে যায়েদ কোলে নিয়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। নবী করিম (সা.) যেসব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন তাকে গাজওয়া বলা হয় যার সংখ্যা মোট ২৭টি। যেসকল যুদ্ধে নবী করিম (সা.) অংশগ্রহণ করেননি অন্যদেরকে সেনাপতি করে পাঠিয়েছেন তাকে বলে সারিয়া। এর অধিকাংশ যুদ্ধে যায়েদ (রা.) কে সেনাপতি করে পাঠিয়েছেন এবং প্রত্যেক যুদ্ধে তিনি বিজয়ী বেশে ফিরেছেন। তাই রাসূল (সা.) তাকে কায়েদে মুয়াফ্‌ফাক বা আল্লাহ তায়ালার তৌফিক বলে আখ্যায়িত করেন।

গোলামের মধ্যে যায়িদ (রা.) প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন আরবদের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীরন্দায। বদর থেকে মুতা পর্যন্ত সকল অভিযানেই অংশগ্রহণ করেন। একমাত্র মীরেইয়াসী অভিযানে যোগদান করতে পারেননি। এ যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে মদিনায় স্থলাভিষিক্ত করে যান।

আল্লাহর রাসূল (সা.) মুতায় অভিযান পরিচালনার জন্য তিন হাজার সৈন্যের এক বাহিনী প্রস্তুত করলেন এবং নেতৃত্বের দায়িত্ব দিলেন যায়িদ ইবনে হারিসার উপর। তখন বড়ো বড়ো সাহাবায়ে কেরামগণকে গোলাম যায়েদের অধীনে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিলেন। রওয়ানার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা.) উপদেশ দিলেন। যদি যায়িদ শহীদ হয়, দলটির পরবর্তী পরিচালক হবে জাফর, সেও যদি শহীদ হয় তাহলে পরিচালক হবে আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহ, যদি সেও শহীদ হয় তাহলে নিজেদের মধ্যে হতে একজনকে পরিচালক নির্বাচন করে নিবে। নবী করিম (সা.) এর ঘোষণা শুনে হযরত যায়েদ (রা.) হযরত বারাকা (রা.) এর নিকট শেষ বিদায় নিতে গেলেন এবং বললেন ওগো বারাকা তুমি কি শুনেছো? রাসূল (সা.) আমাকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করে বুশরার রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠাচ্ছেন। শুনে বারাকা (রা.) বললেন আল্লাহর তরফ থেকে নিরাপত্তা ও বিজয় তোমার সাথে হোক। যায়েদ (রা.) উত্তরে বললেন কিন্তু আমি এ যাত্রায় বিশেষ ইঙ্গিত পাচ্ছি, বারাকা (রা.) বললেন সেকি কি ইঙ্গিত পাচ্ছো? যায়েদ (রা.) বললেন কোনো যুদ্ধে একাধিক সেনাপতি নিযুক্ত করেননি এবারে তিনজনের নাম ঘোষণা করেছেন। যায়েদ (রা.) এর কথা শুনে তিনি জবাবে বললেন রাসূল (সা.) তোমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন এবং তোমাকে

উপযুক্ত মনে করেই এ দায়িত্ব তোমার উপর অর্পন করেছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তোমাকে এ দায়িত্ব পালন করতেই হবে। বারাকা (রা.) এর কথা শুনে যায়েদ (রা.) বললেন আমি আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টির পথে কোনো কিছুই পরওয়া করিনা, শুধু তাদের সন্তুষ্টি আমার জীবনের কাম্য।

যায়িদের নেতৃত্বে বাহিনী মদিনা থেকে যাত্রা করে জর্ডানের পূর্ব সীমান্তে মায়নি নামক স্থানে পৌছল। রোম সম্রাট হিরাকল গাসসানীদের পক্ষে প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে এক লক্ষ্য সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলো। তার সাথে যোগ দিল পৌত্তলিক আরবদের আরও এক লাখ সৈন্য। এ সম্মিলিত বাহিনী মুসলিম বাহিনীর অনতিদূরে অবস্থান গ্রহণ করল। মায়ানে মুসলিম বাহিনী দু'রাত অবস্থান করে করণীয় বিষয় সম্পর্কে পরামর্শ করলেন। কেউ বললেন, পত্র মারফত শত্রু বাহিনীর সংখ্যা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে অবহিত করে পরবর্তী নির্দেশের প্রতিক্ষায় থাকা উচিৎ। কেউ বললেন, আমরা সংখ্যা, শক্তি বা আধিক্যের দ্বারা লড়াই করি না। আমরা লড়াই করি দীনের জন্য। যে উদ্দেশ্যে তোমরা বের হয়েছো, সেজন্য এগিয়ে চল। হয় বিজয় না হয় শাহাদাত, এর যে কোনে একটি সাফল্য তোমরা লাভ করবে।

অতঃপর এ দুই অসম বাহিনী মুখোমুখি সংঘর্ষে অবতীর্ণ হল। দু'লাখ সৈন্যের বিরুদ্ধে মাত্র তিন হাজার সৈন্যের বীরত্ব ও সাহসিকতা দেখে রোমান বাহিনী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। তাদের অন্তরে ভীতিরও সঞ্চার হল। যায়িদ ইবন হারিসা রাসূলুল্লাহ (সা.) পতাকা সমুন্নত রাখার জন্য যে বীরত্ব সহকারে লড়াই করেন তার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। তীর ও বর্ষার অসংখ্য আঘাতে তার দেহ ঝাঝড়া হয়ে গেল। অবশেষে তিনি রণক্ষেত্রে ঢলে পড়লেন এবং শাহাদাতের মর্যাদা নিয়ে মহান আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রিয় যায়িদকে শাহাদাতের সৌভাগ্য দান করার জন্য পূর্বেই শাহাদাতের খবর দিয়েছিলেন আর তিনিও তা গ্রহণ করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হলেন এবং শাহাদাত বরণই ছিল জীবনের বড়ো পাওনা। মৃত্যু সংবাদ শুনে আল্লাহর রাসূল (সা.) যায়িদের বাড়ি পৌছলে তার ছোট্ট মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জড়িয়ে ধরে এবং আল্লাহর রাসূল উচ্চ স্বরে কেঁদে ফেলেন। তার এ অবস্থা দেখে সাদ ইবনে উবাদা বলে উঠেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! একি? তিনি বললেন, এ হচ্ছে ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ। রাসূলের প্রতি ভক্তি, ভালবাসা, আনুগত্য ও তার সন্তুষ্টি অর্জনই ছিল যায়িদের জীবনের একমাত্র ব্রত।

নবী করিম (সা.) কে মহান আল্লাহ কোনো ছেলে সন্তান দান করেননি, যারা ছিলেন তারা ছোট সময়েই ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু মহান আল্লাহ তাকে দান করেছিলেন গোলাম যায়েদ (রা.) কে। তিনি রাসূল (সা.) এর সন্তানদের চাহিদা পূরণ করে পৃথিবীতে কেয়ামত পর্যন্ত উজ্জল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। হযরত যায়েদ (রা.) একটি মুহূর্তের জন্যও রাসূল (সা.) এর কোনো নির্দেশের অবাধ্য হননি। কুরআনে পাকে কোনো সাহাবার নাম মহান আল্লাহ উল্লেখ করেননি কিন্তু যায়েদ (রা.) নাম উল্লেখ করেছেন সুরা আহযাব আয়াত নং-৩৭

হযরত আয়শা (রা.) বলেন যদি হযরত যায়েদ (রা.) জীবিত থাকতেন তাহলে মৃত্যুর সময় রাসূল (সা.) তাকেই স্থলাভিষিক্ত করে যেতেন (আসহাবে রাসূল)।

হযরত উসামা (রা.)

নবী করিম (সা.) একদিন মসজিদে নববীতে ঘোষণা করলেন, তোমাদের মধ্যে কে আছো, একজন জান্নাতী নারী বিয়ে করতে চাও। হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.) তিনবার দাড়াঁলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল আমি বিয়ে করতে চাই। সে জান্নাতী মহিলা হচ্ছেন, নবী করিম (সা.) মা আমেনার দাসী বারাকা আল হারাশিয়্যা। নবী করিম (সা.) বলতেন, আমার মায়ের পর ইনিই আমার মা এবং আমার আহালদের অবশিষ্ট ব্যক্তি। মা আমিনার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বারাকা লালন পালন করেন। মদিনায় মা আমিনার মৃত্যুর পর আল্লাহর রাসূল (সা.) কে বুকে জড়িয়ে মক্কাতে নিয়ে আসেন এই বারাকা। হযরত জয়নাবকে (রা.) কে তালাক দেওয়ার পর হযরত যায়েদ (রা.) আল্লাহর রাসূলের একান্ত ইচ্ছায় হযরত বারাকা (রা.) কে বিবাহ করেন। হযরত যায়েদ এবং বারাকা উভয়ই ছিলেন আল্লাহর রাসূলের নিকট প্রিয় ব্যক্তি এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পরিবারেই তারা লালিত পালিত হন। তাদেরই সন্তান হযরত উসামা (রা.), তার জন্মের খবর শুনে খোদ আল্লাহর রাসূল এবং মক্কার সমগ্র মুসলিম সমাজ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ছিলেন।

নবী করিম (সা.) সবচেয়ে ভালোবাসতেন যায়িদ ও বারাকার পরিবারকে। রাসূল (সা.) সবচেয়ে প্রিয় দম্পতি ছিলেন বারাকা ও যায়েদ (রা.)। রিসালাত প্রাপ্তির সপ্তম বছর জন্মগ্রহণ করেন উসামা (রা.)। নবী করিম (সা.) স্নেহ, মায়া মমতা ও আদরে লালিত পালিত হন উসামা (রা.)। নবী করিম (সা.) হাসান (রা.) কে যতটুকু ভালোবাসতেন ঠিক তেমনি ভালোবাসতেন গোলামের ছেলে উসামা (রা.) কে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) উসামাকে এত অধিক ভালোবাসতেন যে, তা দেখে বিশ্ববাসীর ঈর্ষা হয়। উসামা ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) দৌহিত্র হাসান ইবন ফাতিমার সমবয়সী। হাসান ছিলেন তার নানা রাসূল (সা.) মতো অপূর্ব সুন্দর, আর উসামা ছিলেন দাস-দাসীর সন্তান এবং চেহারা হাবশী মায়ের মতো কালো ও খাদা নাক বিশিষ্ট। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের দুজনকে স্নেহ ও ভালোবাসার ক্ষেত্রে মোটেই কম বেশি করতেন না, নিম্ন শ্রেণির গোলামের সন্তান হওয়ার পরও তিনি আদর করে বসাতেন এক উরুর উপর এবং হাসানকে অন্য উরুর উপর। তারপর নিম্ন শ্রেণির গোলামের সন্তান হওয়ার পরও উভয়কে এক সাথে বুকের মাঝে চেপে ধরে বলতেন, হে আল্লাহ আমি তাদের দুজনকে ভালবাসি, তুমিও তাদের উভয়কে ভালবাস। কি অপূর্ব সাম্যের দৃষ্টান্ত, সকল মানুষ এক, সকলেই আল্লাহর বান্দা, তাদের মধ্যে নেই কোনো ভেদাভেদ। এ শিক্ষাই রাসূল (সা.) দিয়েছেন সারাজীবনভর, এর ব্যতিক্রম করেননি।

একদিন ঘরের চৌকাঠে ধাক্কা লেগে উসামা পরে গেল। তার কপাল থেকে রক্ত বের হতে লাগল। রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রথম হযরত আয়িশাকে রক্ত মুছে দিতে বললেন কিন্তু তাতে স্বস্তি পেলেন না, তিনি নিজেই উঠে উসামার রক্ত মুছে ক্ষত স্থানে চুমু দিতে লাগলেন এবং মিষ্টি মধুর ও দরদ মিশ্রিত কথা বলে শান্তনা দিতে লাগলেন। যৌবনে উসামার মধ্যে এমন সব চারিত্রিক সৌন্দর্য ও গুণাবলী বিকশিত হলো যা সহজেই

রাসূলুল্লাহ (সা.) স্নেহ ও ভালবাসা অর্জন করতে সক্ষম হয়। তীক্ষ্ণ মেধা, দুঃসাহসী, বিচক্ষণতা, পুতঃপবিত্র চরিত্র এবং তাকওয়া ও পরহেজগারী ছিল তার বিশেষ বৈশিষ্ট।

একবার কুরাইশদের অন্যতম নেতা হাকিম ইয়ামানের বাদশার একটি চাঁদর পঞ্চাশ দিরহাম দিয়ে খরিদ করে তা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে উপহার দিল। কিন্তু সে মুশরিক থাকার কারণে নবী করিম (সা.) হাকিম থেকে চাঁদরটি খরিদ করে উসামার গায়ে পরিয়ে দেন। উসামা মূল্যবান চাঁদরখানি পরে তার সমবয়সী মুহাজির ও আনসার যুবকদের সাথে সকাল সন্ধ্যা ঘুরে বেড়াতেন। রাসূল (সা.) উসামার দিকে তাকিয়ে আনন্দ লাভ করতেন এবং আত্মতৃপ্তি প্রকাশ করতেন।

উহুদের যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে হযরত উসামা (রা.) এর বয়স তখন কৈশরের শেষ প্রান্তে। মাঝ বয়সি সাথীদের সাথে তিনিও যুদ্ধে যাওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে যান কিন্তু বয়স কম হওয়ায় রাসূল (সা.) তাকে ফিরিয়ে দিলেন। উসামা চোখের পানি ফেলতে ফেলতে চলে যাচ্ছেন। যতক্ষন উসামাকে দেখা যাচ্ছিল, ততোক্ষন তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন স্নেহ ও ভালবাসার আকর্ষণে, বিশ্বনবী (সা.) উসামার দিকে তাকিয়ে আনন্দ লাভ করতেন, আত্মতৃপ্তি প্রকাশ করতেন।

খন্দকের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি চলছে, উসামাও হাজির। উহুদের মতো এবারেও তাকে ছোট বলে বাদ দেওয়া না হয় এজন্য পায়ের আঙুলে ভর করে উচু হয়ে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তার আগ্রহ দেখে তাকে নির্বাচন করলেন। তরবারি কাঁধে ঝুলিয়ে তিনি চললেন জিহাদে। তিনি তখন ১২ বছরের এক কিশোর। উসামা সর্বপ্রথম হারাকা অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। তখন তার বয়স ১৪ বছর, কিন্তু তার সীমাহীন যোগ্যতার কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে অভিযানের নেতৃত্বে বসান, উসামা মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সঙ্গী, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে একই বাহনে সওয়ার হয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে আল্লাহর ঘরে প্রবেশের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

উসামা তার পিতা সেনাপতি যায়িদ ইবনে হারিসার সাথে মুতা অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ যুদ্ধে তিনি স্বচক্ষে তার পিতার শাহাদাতের করুণ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন। তবে তিনি মুষড়ে পড়েননি, পিতার শাহাদাত বরণের পর জাফর (রা.) ও আব্দুল্লাহ (রা.) নেতৃত্বে বাহাদুরের মতো লড়াই করেন। এ তিন নেতার শাহাদতের পর সেনাপতি খালেদ ইবন ওয়ালীদের নেতৃত্বে যুদ্ধ করেন এবং মুসলিম বাহিনীকে রোমান বাহিনীর পাঞ্জা থেকে উদ্ধার করেন। মুতার প্রান্তরে পিতা যায়িদের মরদেহ আল্লাহর হাওয়ালা করে যে ঘোড়ার উপর তিনি শহিদ হয়েছিলেন, তার উপর সাওয়ার হয়ে তিনি মদিনায় ফিরে এলেন।

একাদশ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (সা.) রোমান বাহিনীর সাথে একটা চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। হযরত আবু বকর, ওমর, সাদ বড়ো বড়ো সমর বিশারদ সাহাবী এ বাহিনীর অন্তর্ভূক্ত হলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) উসামা বিন যায়েদ (রা.) কে এ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করেন।

অনেকেই উসামার সেনাপতি হওয়া মেনে নিতে পারেননি। অসুস্থ অবস্থায় নবী করিম (সা.) মাথায় কাপড় বেধে মসজিদে নববীতে উপস্থিত হয়ে সবাইকে ডেকে বললেন, আজ উসামার নেতৃত্বে তোমাদের আপত্তি দেখা দিয়েছে। তার পিতা যায়েদের নেতৃত্বের উপযুক্ত ছিল তার ছেলে উসামাও এ পদের জন্য সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি। সেও আমার নিতান্ত প্রিয়পাত্র ছিল, এও আমার অত্যন্ত প্রিয়। আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেন যারা উসামা (রা.) এর নেতৃত্ব অস্বীকার-অমান্য করবে, বিরোধীতা করবে তাদের উপর আল্লাহর লানত। (আল মিলাল ওয়াল নাহাল)

বাহিনী যাত্রার জন্য প্রস্তুত। এদিকে রাসূলুল্লাহ (সা.) পীড়িত হয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) খবর শুনে মদিনার উপকণ্ঠে জুরুফ' নামক স্থানে বাহিনী অবস্থান করলেন। সেখান থেকে প্রতি দিন রাসূলুল্লাহ (সা.) কে দেখতে আসতেন। একদিন উসামা দেখতে আসলেন, তিনি দেখলেন হুজুর (সা.) এর রোগ বৃদ্ধি পেয়েছে, তিনি অচেতন, চুপ হয়ে আছেন। উসামা বর্ণনা করেন আমাকে দেখে আসমানের দিকে হাত উঠালেন। তারপর আমার শরীরের ওপর হাত রাখলেন। আমি বুঝলাম তিনি আমার জন্য দোয়া করছেন। ওসামাকে দেখে হুজুর (সা.) বললেন আমাকে একটি চিরকুট দাও কিন্তু বড়ো বড়ো সাহাবাগণ তা দিতে রাজী হলেন না। কোনো কোন ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, নবী করিম (সা.) ঐ চিরকুটের মধ্যে ওসামা (রা.) কে পরবর্তী খলিফা নিযুক্ত করতেন। যার কারণে এই চিরকুট রাসূল (সা.) এর হাতে দেননি। যেমনভাবে ওসামা (রা.) কে সেনাপতি করার ব্যাপারে তাদের আপত্তি ছিল। নবী করিম (সা.) ইন্তেকালের খবর শুনে মদিনায় এলেন, তার দাফন-কাফনে অংশগ্রহণ করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) পবিত্র লাশ ধরে নামানোর সৌভাগ্যও তিনি অর্জন করলেন।

নবী করিম (সা.) ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর (রা.) খলিফা নির্বাচিত হয়ে হযরত উসামাকে সেনাপতির পদে বহাল রাখেন যদিও অনেকে এ পদ থেকে তাকে বাদ দেওয়ার মতামত ব্যক্ত করেছিলেন কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) তাতে রাজী হননি। যুবক কমান্ডার, তখন বয়স ১৮/১৯ বছর, বাহিনী তার নেতৃত্বে রওয়ানা করেন। ওসামা রাসূলুল্লাহ (সা.) আদেশ অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করেন। মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনী ফিলিস্তিনের 'বালকা' ও 'কিলায়াতুত দারুম সীমান্ত পদানত করে। ফলে এ অঞ্চল থেকে মুসলমানদের জন্য রোমান ভীতি চিরতরে দুরীভুত হয় এবং গোটা সিরিয়া, মিশর ও উত্তর আফ্রিকাসহ কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগের বিজয়দ্বার উন্মুক্ত হয়। তিনি তার পিতার হত্যাকারীদের প্রতিশোধ গ্রহণ করে বিপুল পরিমাণ গনিমতের ধন সম্পদ নিয়ে বিজয়ী বেশে মদিনায় ফিরে আসেন। এরপর এ মহান সেনানায়ক নীরব হয়ে যান এবং ৬০ বছর বয়সে হযরত মুয়াবিয়ার শাসন আমলে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। বুখারী ও মুসলিম শরিফের বর্ণনা মতে হযরত উসামা (রা.) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) উপস্থিতিতে তিনি জিবরাঈল (আ.) কে দেখতে পেয়েছেন।

লেখক: ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

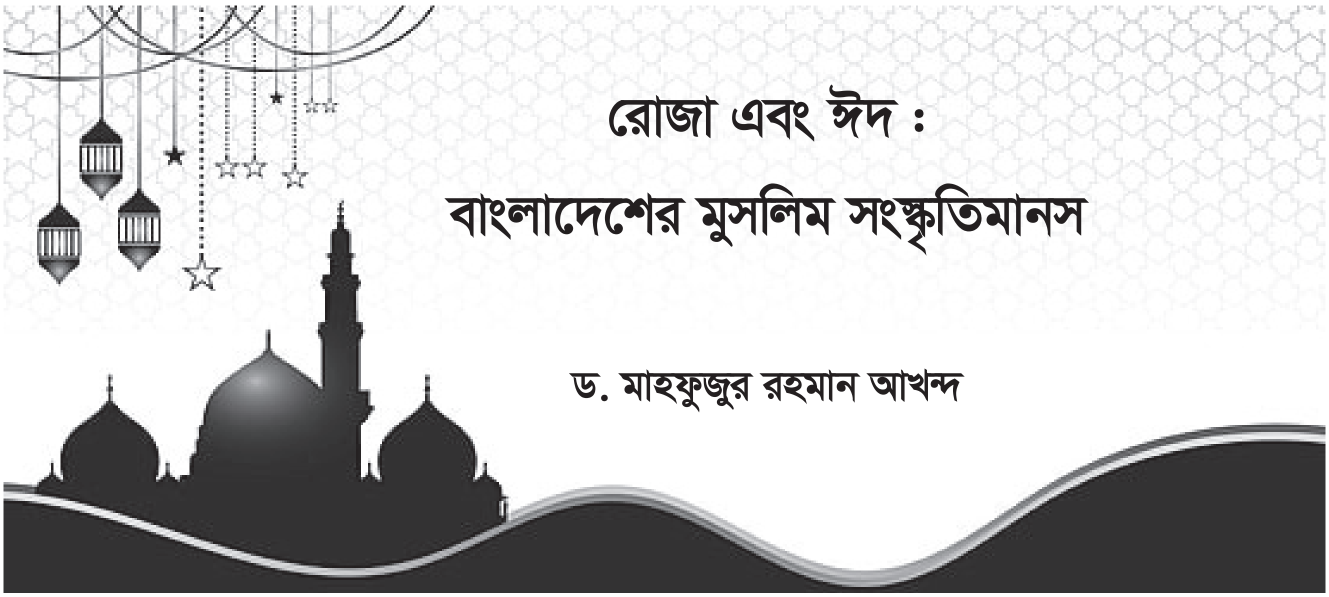

রোজা এবং ঈদ : বাংলাদেশের মুসলিম সংস্কৃতিমানস

ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ

ঈদ এমন একটি উৎসব যার পরশে সোনালি আভায় উজ্জ্বল হয়ে মুমিন হৃদয়। ধনী-গরিব, মালিক-শ্রমিক, বাদশা-ফকির সকলের জন্যই উৎসবের পরশ আনে ঈদ উৎসব। পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় নেমে আসে খুশির জোয়ার। এ জন্য বলা হয়- ঈদ হচ্ছে ইসলামি জীবন-দর্শনের সফলতার সম্মিলন। কারণ ঈদ উৎসবের মূলে রয়েছে আত্মার পরিশুদ্ধি এবং চারিত্রিক উন্নতির শুভ সংবাদ। আর এ উৎসবের মাধ্যমেই মানুষে মানুষে ওই শুভ সংবাদ এবং ভালবাসা পরস্পর ভাগাভাগি করে নেয়। তাদের জন্য আজকের এ উৎসবে বিরাজ করে জান্নাতি পরিবেশ। তাই হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে ঈদ আনন্দে ধনী-গরিব আজ এক কাতারে শামিল। এ ঈদ মানব প্রেমে ঝলসে ওঠার অনন্য অঙ্গীকার। রমজানের মাসব্যাপী সিয়াম সাধনায় মানুষের মন হয়ে ওঠে উদার, সহমর্মিতাপূর্ণ ও আল্লাহর প্রেমের প্রেমিক। রমজান মাসে যারা প্রবৃত্তির প্ররোচনাকে দমন করে বিবেকের শক্তিকে জাগ্রত করতে পেরেছেন, ঈদের দিন মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দেন। এজন্য রোজাদারদের জন্য ঈদের এ দিনটি বিরাট এক প্রাপ্তির দিন। এ কারণেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদকে মুসলমানদের জাতীয় উৎসব হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন।

ঈদ মুসলমানদের জাতীয় সাংস্কৃতিক চেতনার প্রধান উৎসব। মুসলমানগণ ঈদ উৎসবের মধ্য দিয়ে নিজেদের অস্তিত্বের প্রমাণ উপস্থাপন করে। যারা দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার দ্বারা আল্লাহ তায়ালার হুকুম পালনের নিমিত্তে কষ্ট স্বীকার করে তাকওয়া বা আত্মসংযমশীলতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে মূলত তাদের জন্যই ঈদ হয়ে ওঠে আনন্দ, খুশি এবং ভালোবাসাবাসির উৎসব। ঈদুল ফিতরের মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন এবং ঈদুল আযহার কুরবানীর মাধ্যমে ত্যাগের প্রশিক্ষণ অর্জিত হয়। ঈদ উৎসবকে একদিকে যেমন ইবাদত নামক আনুষ্ঠানিকতার কড়া শাসনের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হয়নি তেমনি একেবারে ইবাদতের শৃঙ্খলা থেকে বিচ্ছিন্ন হবারও সুযোগ করে দেয়নি। ঈদের নামাজ, খুতবা ও আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে যে সহজবোধ্যতা আছে, তেমনি আছে সুসংঘবদ্ধতার মহান শিক্ষা। এর মাধ্যমে ধনী-গরীব, বাদশাহ

“ঈদ মুসলমানদের জাতীয় সাংস্কৃতিক চেতনার প্রধান উৎসব। মুসলমানগণ ঈদ উৎসবের মধ্য দিয়ে নিজেদের অস্তিত্বের প্রমাণ উপস্থাপন করে। যারা দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার দ্বারা আল্লাহ তায়ালার হুকুম পালনের নিমিত্তে কষ্ট স্বীকার করে তাকওয়া বা আত্মসংযমশীলতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে মূলত তাদের জন্যই ঈদ হয়ে ওঠে আনন্দ, খুশি এবং ভালোবাসাবাসির উৎসব।”

ফকির সকল শ্রেণির মানুষকে উন্মুক্ত ময়দানে সমবেত করে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। জাতীয় ঐক্য ও সংহতি, দেশপ্রেম, মানবতাবোধ জাগানো, আভিজাত্যের মিথ্যা অহংকার এবং সামাজিক ব্যবধানে কুঠারাঘাত করে মানুষে মানুষে ব্যবধান কমানো, সর্বোপরি সকল মুসলমান ভাই ভাই এ মহান মন্ত্রে উজ্জীবিত করে ঈদ উৎসবের নানাবিধ কর্মসূচি। এ দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করেই কবি গোলাম মোস্তফা ঈদকে মানবতার বিরাট প্লাটফর্ম হিসেবে কল্পনা করেছেন।

মানব জীবনের সূচনা থেকে কবর পর্যন্ত জীবন-জীবিকা, হাসি কান্নাসহ প্রত্যেকটি অধ্যায়ের বিজ্ঞানসম্মত সমাধান ইসলামে থাকায় এটাকে অন্য কোনো ধর্মের সাথে তুলনা করা যায় না। ইসলামের প্রত্যেকটি বিধানের মধ্যেই মানুষের মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে। কেননা এতে হাসি-কান্না, বিনোদন-বিসর্জন সবই সীমারেখার মধ্যে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিনোদনের ক্ষেত্রে যেমন স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ নেই, তেমনি বিসর্জনের মধ্যেও বিলাপে সীমাবদ্ধতার ছক বেধে দেওয়া হয়েছে। প্রাক ইসলামী আরবে মিহিরজান ও নওরোজ অনুষ্ঠানসহ 'উকাজ মেলার' মাধ্যমে বিনোদনের নামে বিশৃঙ্খলা, উচ্ছৃঙ্খলতা, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার পরিবেশ তৈরি করত, পক্ষান্তরে মুসলমানদের ঈদ উৎসবের মধ্যদিয়ে বিনোদন উপভোগ করলেও তা হয়েছে কল্যাণকামী, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের এক অপূর্ব মহাসম্মিলন। ঈদ শুধু আনন্দের নয়, কল্যাণের, মঙ্গলের এবং মুক্তিরও উৎসব।

তীব্র ক্ষুধা-তৃষ্ণাকে উপেক্ষা করে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিয়াম সাধনার মাধ্যমে চিন্তাচেতনায় এই বিষয়টি এমনভাবে নাড়া দেয় যে, চরম কষ্ট ও অভাবের সময়ও আল্লাহর নির্দেশ এবং নিয়মাবলী শিরোধার্য ও অত্যাবশ্যকীয়ভাবে পালনীয়। রোজার মাস শেষ হবার পর পরই ভোগ বিলাস ও নফসের দাসত্বের শিকারে পরিণত হবে না, বরং ঈদের নামাজের মাধ্যমে তাকওয়া অর্জনের মাস সফলভাবে অতিবাহিত করার শুকরিয়া আদায়ের ব্যবস্থা করা যাতে বাকী ১১টি মাস আত্মসংযমশীলতার সাথে অতিবাহিত করার তৌফিক অর্জন করা যায়। গরীব ধনী আল্লাহরই সৃষ্টি। সবারই মন চায় সুন্দর উৎসবমুখর জীবনের স্বাদ পেতে। তাই ঈদুল ফিতরের ঈদগাহে যাবার পূর্বেই তাকে ফিতরা আদায় করতে হয়। গরীব, দুস্থ সকল শ্রেণির মানুষ যাতে ঈদ উৎসবে শরীক হয়ে কিছুক্ষণের জন্য হলেও উৎসবমুখর জীবনের স্বাদ পায় তার যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া। কবি কাজী নজরুল ইসলাম তার গানে উল্লেখ করেন–

তোর সোনাদানা বালাখানা/ সব রাহে লিল্লাহ
দে জাকাত মুর্দা মুসলিমের আজ / ভাঙ্গাইতে নিঁদ।

ঈদ প্রেম ভালবাসার উৎসব। মিলন আর ঐক্য সংহতির উৎসব। এ উৎসব আত্মকেন্দ্রিক কিংবা ঘরমুখো নয়। এ উৎসব সমাজমুখী, গণমুখী যা ভ্রাতৃত্বের সমাজ গড়ার উৎসাহ যোগায়। ঈদ উৎসবের মধ্য দিয়ে নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার মিলন ঘটে। ত্যাগ ও ভোগের সমন্বয় সাধিত হয়। উন্নত পোশাক ও ভাল রান্নাবান্নার মাধ্যমে যেমন বৈষয়িকতার প্রকাশ ঘটে তেমনি দরিদ্রদের মাঝে খাদ্য বিতরণ ও

তীব্র ক্ষুধা-তৃষ্ণাকে উপেক্ষা করে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিয়াম সাধনার মাধ্যমে চিন্তাচেতনায় এই বিষয়টি এমনভাবে নাড়া দেয় যে, চরম কষ্ট ও অভাবের সময়ও আল্লাহর নির্দেশ এবং নিয়মাবলী শিরোধার্য ও অত্যাবশ্যকীয়ভাবে পালনীয়। রোজার মাস শেষ হবার পর পরই ভোগ বিলাস ও নফসের দাসত্বের শিকারে পরিণত হবে না, বরং ঈদের নামাজের মাধ্যমে তাকওয়া অর্জনের মাস সফলভাবে অতিবাহিত করার শুকরিয়া আদায়ের ব্যবস্থা করা যাতে বাকী ১১টি মাস আত্মসংযমশীলতার সাথে অতিবাহিত করার তৌফিক অর্জন করা

আত্মীয় স্বজনদের হক আদায়ের মধ্য দিয়ে আত্মিক প্রশান্তিরও সমন্বয় ঘটে। ঈদ রুচিশীল ও মননশীল সংস্কৃতির শিক্ষা দেয়। এতে যেমন আনন্দ ও বিনোদনের ব্যবস্থা আছে তেমনি তা আল্লাহ ও রসূল (সা.) বিমুখ নয়। ঈদ উৎসব সময়ানুবর্তিতা ও নিয়মানুবর্তিতা শেখায়। চাঁদ দেখে রোজা শুরু করা ও শেষ করার মধ্য দিয়ে যেমন সময়ানুবর্তিতা শেখা যায় তেমনি ইফতার, সাহরি ও ঈদগাহের নামাজ আদায়ের মধ্য দিয়ে সময়ানুবর্তিতারও শিক্ষা পাওয়া যায়। এভাবে মুসলমানদের জীবনে ঈদুল ফিতর এক উজ্জ্বল ও সুন্দর শৃংখলাবোধের সম্মিলন ঘটায়। মূলত রমযান এক মাসের একটি প্রশিক্ষণ কোর্স। এ কোর্সের প্রশিক্ষক স্বয়ং আল্লাহ এবং শিক্ষার্থী হল মুসলিম উম্মাহ। এর সিলেবাস রমযানের নিয়মকানুন এবং নম্বরপত্র হচ্ছে তাকওয়া অর্জন আর এর সুদূরপ্রসারী ফলাফল হচ্ছে বাস্তব জীবনের প্রত্যেক ধাপে ধাপে প্রতিটি পদে পদে তাকওয়ার সুচিন্তিত ব্যবহার। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা কতটুকু সফল হচ্ছি তা বিশ্লেষণের দাবি রাখে বৈকি।

প্রথমত. রমযান মাস আসে ক্ষুধা তৃষ্ণার কষ্ট অনুধাবন করার শিক্ষা নিয়ে। সমাজের গরীব, অনাথ ও কথিত নিচু শ্রেণির মানুষের জীবন যাত্রা বিশেষত ক্ষুধা পিপাসার কষ্ট অনুভব করে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হবার জন্য রোজা আসে। ঈদ উৎসবে তা পরিপূর্ণতার কথা থাকলেও বাস্তবে তা পাওয়া যাচ্ছে কি? ঈদ উপলক্ষ্যে হাই-ফাই স্টাইলে শাহী বাজার করার জন্য মাসিক বেতন কিংবা অর্জিত টাকার চেয়ে আরও বেশি কিছু চাই। সরকারিভাবে অনেকের বোনাসের ব্যবস্থা থাকলেও তা দিয়ে উদর, চোখ ও মন কিছুই ভরে না; আরও চাই, মিসেসের জন্য দামী শাড়ি, পরিবারের সদস্যদের জন্য চোখ ধাঁধাঁনো ঈদ মার্কেট না হলেই নয়। এ ধাক্কা সামাল দিতে রোজার মাসে তাই ঈদ খরচের জন্য ঘুষ নেওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। ঘুষটা অবশ্য সরাসরি হাতে না নিয়ে কেউ কেউ পকেটে কিংবা টেবিলের ড্রয়ারে রেখে যেতে বলেন কিংবা পিয়ন চাপরাসি দ্বারা নেয়ার ব্যবস্থা করেন, কেননা হাজারো হলেও রোজার মাস তো। এ মাসে আত্মসংযমশীল হবার কথা থাকলেও ঈদ খরচের জন্য ছিনতাই ও চাঁদাবাজিও বেড়ে যায় বহুগুণে। যারা এসব করেন তাদেরও একটি বৃহত্তম অংশ মুসলমান নামধারী এবং রোজা না রাখলেও ইফতারির টেবিলে রাজপরিবেশে ইফতার করেন।

দ্বিতীয়ত. রোজার অর্জিত 'তাকওয়া' পরবর্তী ১১ মাসের ট্রেনিং কোর্স হলেও তা সাধারণত রোজার প্রথম দশক পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। সারা বছর নামাজ না পড়লেও রোজার সময় তারাবী'র নামাজের সময় মসজিদে জায়গা পাওয়া কঠিন। এটি অত্যন্ত আশার দিক যে অন্তত রোজার প্রভাব তারাবী'তে পড়েছে। কিন্তু প্রথম দশকের পর অবশ্য সে দৃশ্যের ভাটা লক্ষ্য করা যায়। এভাবে রোজার শেষ দশকে মসজিদে সাবেক চিত্রই ফুটে ওঠে। তবে ২৬ রমজান দিবাগত রাত্রে 'কদরের' ফজিলতের উসিলায় মসজিদে উপচে পড়া ভীড় থাকে। অবশ্য ফজরের সময় সেই সাবেক চিত্র; শূন্য কাতার। এরপরে ভীড় জমে ঈদগাহের নামাজে। শুধু সুন্দর ও পরিপাটি নয় বরং বাহারী পোশাকের ভীড়ে আসল রোজাদার ঠাঁই পায় না প্রথম সারিতে। ঈদগাহ থেকে ফিরে যোহর নামাজে মসজিদে যাবার সময় কোথায়! ঈদের আনন্দ, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্টিং মিডিয়ার বদৌলতে অনুষ্ঠানের তো আর শেষ নেই। অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান, পত্রিকার ক্রোড়পত্র বিনোদনে অপসরিদের উলঙ্গ শরীর এবং সুন্দর ছবির দৃশ্য উপভোগ, মেহমানদারীর ভীড় ইত্যাদিতেই সময় কাটে। সেদিন থেকেই তাকওয়ার চেতনায় কড়া মৌলবাদী গন্ধ, অতএব এটা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

তৃতীয়ত. ঈদ উৎসবে গরীবদের শরীক করানোর জন্য আগে-ভাগে ফিতরা আদায়ের বিধান থাকলেও তা আদায় করতে আমাদের অনীহা পরিলক্ষিত হয়। এমনকি ফিতরা থেকে বাঁচার কৌশল খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে কম ওজন ও কম মূল্যমান অনুসারে ফিতরা কার্যকর করার দিকে বেশি খেয়াল থাকে। এ অবস্থাতেও ফিতরা বাকী রাখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এটা মুসলিম উম্মাহর জন্য শুধু বেদনাদায়কই নয়, কলঙ্ক জনকও বটে। এ অবস্থার উত্তোরণ ঘটাতে হবে।

চতুর্থত. ঐক্য শক্তি শান্তি প্রগতি তথা ভ্রাতৃত্ববোধ, বৈষয়িকতা ও আধ্যাত্মিকতা সম্মিলন ঘটানোর মাধ্যমে মানবতাবোধে উজ্জীবিত হবার জন্যই ঈদ উৎসব। অথচ ঈদের কেনাকাটা থেকে শুরু করে যে কোন ঘরোয়া অনুষ্ঠানেও রোজার পরিবেশ চোখে পড়ে না। অন্যকে ঠকিয়ে নিজের পকেট ভর্তির জন্য পন্য বিক্রির সময় গুণগত মানের ক্ষেত্রে যেমন প্রতারণা তেমনি মূল্যের ক্ষেত্রেও আকাশ পাতাল পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সেইসাথে বেপর্দা সাজোয়া নারীদের কেনাকাটার ভীড়ে দোকানে যেমন চান্স পাওয়া কঠিন তেমনি তাদের পারফিউমের উদ্ভট ও বিচিত্রময় প্রয়োগে রোজাদারের রোজার পবিত্রতা যে কোথায় পালায় তা ভুক্তভোগী মাত্রই অবগত। এ পরিবেশ যেমন মার্কেটে তেমনি বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানেও। ঈদ উপলক্ষ্যে প্রিন্টিং মিডিয়ার ক্রোড়পত্রে চোখ রাখলেও রোজার অর্জিত তাকওয়া ভয়ে পালানোর রাস্তা খুঁজতে থাকে। টিভি, সিনেমা ও ভিসিডি পল্লীতে চলে নতুন নতুন শুভমুক্তি ও অশ্লীলতার সাজ সাজ রব। সত্যিকার অর্থে ঈদের দিন মনেই হয় না যে একটি মাস আমরা তাকওয়ার প্রশিক্ষণ নিয়েছি। খাঁচাবন্দী ক্ষুধার্ত বাঘ, সিংহ ও হায়নাদের ছাড়া পাওয়ার পর যে দৃশ্য তার কোনো ঘাটতি থাকে না আমাদের মধ্যে। এমনকি সিনেমা ও ভিসিডির দোকান চত্বরে টিকিট কেনা কিংবা নতুন ছবি নেয়ার প্রতিযোগিতায় শুরু হয় হাতাহাতি থেকে চাকু-মারামারি অবশেষে বন্দুকযুদ্ধ এবং লাশ। এটাই কি ভ্রাতৃত্ববোধ, বৈষয়িকতা এবং আধ্যাত্মিকতার মহামিলন? অপসংস্কৃতির এ ছোবল এখন শুধু শহরেই নয় গ্রামেও পুরোপুরিভাবে প্রবেশ করেছে। এমনকি ঈদের দিনে মহিলাদের সাজসজ্জা ও বেপর্দামূলক চলাফেরা শুধুমাত্র পরহেজগার পুরুষদেরই বিব্রত করে না বরং পর্দানশীল মহিলারাও এ দৃশ্য দেখে লজ্জিত হন।

পঞ্চমত. সিয়াম ও ঈদ সময়ানুবর্তিতা নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা দিলেও ঈদের দিন থেকে তা রহিত হয়ে যায়। অফিস ফাঁকি দেবার কার্যক্রম শুরু হয় এ ঈদকে ঘিরেই। পরিবহনেযাত্রী হয়রানীও লক্ষ্যনীয় হারে বেড়ে যায়। ঈদের ছুটি শেষ হলেও অফিসসমূহে ঈদের আমেজে চেয়ার শূন্য থাকে প্রায় এক সপ্তাহ। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও এ থেকে বাদ যায় না। ঈদের ছুটি শুরু হওয়ার এক সপ্তাহ পূর্ব থেকেই ক্লাস ফাঁকা আবার শুরুও হয় এক দশক পরে; বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে এ চিত্র চিরাচরিত। তাহলে ঈদের শিক্ষা কি যাত্রী হয়রানী কিংবা অফিস ও ক্লাস ফাঁকি দেওয়া?

একজন মুসলমান যেমন ঈমানের দাবী পূরণের জন্য নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, দান-সদকাসহ ইসলামের মৌলিক কাজগুলো সম্পাদনের মাধ্যমে সওয়াবের অধিকারী হয়, তেমনি তিনি যদি উৎসব, বিনোদন, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, বিষাদ-আনন্দসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী চিন্তা চেতনাকে প্রেরণার উৎস হিসেবে ধারণ করে সম্পাদন করেন তবে তিনি এ ক্ষেত্রেও ঈমানের দাবী পুরণের পাশাপাশি বিপুল সওয়াবের অংশীদার হবেন।

ষষ্ঠত. রোজা ও ঈদকে ঘিরে কিছু কিছু কালচার গড়ে উঠেছে যা বাহ্যত সত্যিই প্রশংসনীয়। বিশেষ করে ইফতার পার্টি, ঈদকার্ড বিতরণ, ঈদ পূর্ণমিলনী প্রভৃতি। এ উৎসবগুলো সত্যিকার অর্থে মুসলিম সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করার কথা। ইফতার পার্টির মাধমে অনেক রোজাদার একত্রিত হয়ে সিয়াম সাধনার ফজিলত, তাকওয়া অর্জনের পদ্ধতি তথা নিজেকে পূর্ণাঙ্গ মুমিন হিসেবে তৈরি করার প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে। অনেক রোজাদার একত্রিত হয়ে সমবেত ইফতার করার মধ্যদিয়ে যেমন আত্মিক প্রশান্তি লাভ করা যায়, তেমনি ভ্রাতৃত্ববোধ ও ঈমানিয়াতে আরও মজবুতি অর্জনের সুযোগ ঘটে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ মাহফিলও এখন স্বার্থ চরিতার্থ করার অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। সামাজিকতা রক্ষা, রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল কিংবা নিজেদের কুকর্ম আড়াল করার জন্যও এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এমনও দেখা যায় যে, ইফতার মাহফিল বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যসচিব রাজেশ মৈত্র কিংবা নগেন ঠাকুর। তখন এটাকে একটি 'আইওয়াশ'মূলক অনুষ্ঠান বলাই যুক্তিযুক্ত নয় কি? রমজানের লাইলাতুল কদর উদযাপনও ইদানিং ঘটা করে করা হয়। উৎসব মুখর পরিবেশে রাত্রি জাগরণ ও ইবাদত করা অপরাধের কিছু নয় বরং অন্যকে উৎসাহিত করা হয় বটে। কিন্তু এতে আতশবাজি, লাইটিং কিংবা অপচয়মূলক খরচ ও আনুষ্ঠানিকতা মোটেই ইবাদত হতে পারে না। এমনকি রান্নাবান্না, হৈচৈ আর আতশবাজির মহড়ায় ইবাদতকারীর খুশুখুজু বিনষ্ট হয়। অন্যদিকে ঈদকার্ডের মাধ্যমে কোনো মুসলিমকে দাওয়াত করা কিংবা ঈদকার্ডের মাধ্যমে ঈদের আমেজকে বৃদ্ধি করাতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু এ ঈদকার্ড বৈধস্থানে কতটা ব্যবহার করা হয় সেটাই বিবেচ্য বিষয়। মূলত এ কার্ডের মহোৎসব অবৈধ প্রেমের মিলন বন্ধনী হিসেবে কপোত-কপোতিদের মধ্যে প্রেমলীলার ক্ষেত্রে উদযাপিত হয় না কি? অথচ ঈদ স্বাভাবিক মানবীয় প্রেম, ভ্রাতৃত্ববোধ, পারিবারিক সম্পর্কের উন্নয়ন সর্বোপরি বিশ্বমুসলিমের ভ্রাতৃত্ববোধ জাগরণের জন্যই বছরে দু'বার আসে। আমরা এ ধরনের ঈদই চাই।

শেষকথা, ঈদ মানে আনন্দ, এ আনন্দ বিশ্বাসের, এ আনন্দ তাকওয়া অর্জনের এবং ইহলৌকিক ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরি ও পারলৌকিক মুক্তির। সুতরাং ঈদকে ঘিরে সকল উৎসবকেই ইতিবাচক হিসেবে পেতে চাই। এমনকি প্রিন্টিং মিডিয়ার সকল প্রকাশনা এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সকল আয়োজনকেই পেতে চাই ঈদের ফিতরাতের উপর ভিত্তি করে। যেমন সাহিত্য পত্রিকা কিংবা পত্রিকার ঈদ ক্রোড়পত্রের গল্প, প্রবন্ধ, ছড়া, কবিতা, রম্য উপন্যাস সকল কিছুই ঈদের পবিত্রতা ও নির্মল আনন্দ উৎসবকে ধারণ করে লিখতে হবে। ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় উপস্থাপিত গান, নাটক, সিনেমা, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, বিচিত্রানুষ্ঠান, এমনকি ফ্যাশনশোও হতে হবে ঈদের ইমেজকে ধারণ করে। তবে যেন ঈদের মৌলিকতা এবং ঈদ আনন্দের বৈষয়িকতা ও আধ্যাত্মিকতার সীমারেখা অতিক্রম না করা হয়। অডিও, ভিডিও, সিডি, ভিসিডি প্রকাশনা কিংবা ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান, আত্মীয়তার মহোৎসব, ঈদকার্ডের ব্যবহার সবকিছুতেই যেন ঈদের মৌলিকতাকে ধারণ করে উদযাপিত হয়। মূলত মানুষকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অর্থাৎ পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সভ্যতা সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, যুদ্ধ ও সন্ধিনীতি, রাষ্ট্রনীতি-পররাষ্ট্রনীতি, বিবাহ-তালাক, শিক্ষা-সাহিত্য সকল বিষয়সমূহ ইসলামের সীমারেখা অনুযায়ী সম্পাদন করা ঈমানের দাবী। একজন মুসলমান যেমন ঈমানের দাবী পূরণের জন্য নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, দান-সদকাসহ ইসলামের মৌলিক কাজগুলো সম্পাদনের মাধ্যমে সওয়াবের অধিকারী হয়, তেমনি তিনি যদি উৎসব, বিনোদন, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, বিষাদ-আনন্দসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী চিন্তা চেতনাকে প্রেরণার উৎস হিসেবে ধারণ করে সম্পাদন করেন তবে তিনি এ ক্ষেত্রেও ঈমানের দাবী পুরণের পাশাপাশি বিপুল সওয়াবের অংশীদার হবেন। এভাবে ঈদের সকল কর্মসূচিসহ অডিও, ভিডিও, সিডি, ভিসিডি, রেডিও, টেলিভিশনসহ স্যাটেলাইটের সকল আয়োজনে ঈমানী চেতনা ও ইসলামী সংস্থার দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়িত হলে তা শুধু বিনোদনই হবে না বরং সওয়াবের মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হবে। এতে নির্মাতা ও দর্শকের জন্য গুনাহের পরিবর্তে সওয়াব, অশ্লীলতার পরিবর্তে শ্লীলতা, অপসংস্কৃতির পরিবর্তে সুস্থ সংস্কৃতি, কুৎসিতের পরিবর্তে সুন্দর, দুর্গতির পরিবর্তে প্রগতি এবং পাপের পরিবর্তে সওয়াবের ব্যবস্থা হবে। এ অবস্থাতে বিনোদনও হবে সওয়াবও হবে। উভয় ক্ষেত্রে লাভজনক উৎস হিসেবে ঈদ উৎসব আমাদের ঘরে ফিরে আসুক, এ কামনা করি।

লেখক: কবি ও গবেষক; প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রমজীবীদের বাজেট কেমন চাই

ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম

প্রতি বছরই বাংলাদেশে জাতীয় বাজেট পেশ এবং পাশ করা হয়। এবারও জাতীয় সংসদে বাজেট পেশ করা হবে এবং ৩০ জুন ২০২২ এর মধ্যে তা কণ্ঠভোটে পাশও হয়ে যাবে। জাতীয় বাজেট প্রণয়ন ও পেশ করা সরকারের একটি নিয়মিত কাজ। এ নিয়মিত কাজটি সব সরকারই বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই করছে। ১৯৭২ সালের ২০ জুন বেতার ও টিভিতে ১৯৭১-৭২ এবং ১৯৭২-৭৩ অর্থ বছর দ্বয়ের বাজেট বাংলাদেশের প্রথম অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ (জীবনকাল ১৯২৫-১৯৭৫) পেশ করেন। ১৯৭৩-৭৪ অর্থ বছরের বাজেটও তিনি সংসদে পেশ করেন। তিনি ছিলেন রাজনীতিবীদ অর্থমন্ত্রী। ১৯৭৫ সালে দেশের প্রথম (টেকনোক্রাট) অর্থমন্ত্রী ড. আজিজুর রহমান মল্লিক (জীবনকাল ১৯১৮-১৯৯৭) বাকশাল সরকারের বাজেট পেশ করেন। ড. মল্লিক ছিলেন একজন টেকনোক্রাট অর্থনীতিবীদ এবং এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর নির্বাচিত চেয়ারম্যান। বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বাজেট (মোট ১২টি) পেশ করেন অর্থমন্ত্রী এম. সাইফুর রহমান (জীবনকাল ১৯৩২-২০০৯) এবং আবুল মাল আব্দুল মুহিত (জন্ম ২৫ জানুয়ারি ১৯৩৪, সিলেট) ১২টি বাজেট পেশ করেন। এবার বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মোস্তফা কামাল।

বাজেট শুধুমাত্র একটি হিসাব নিকাশের খাতা বা বাৎসরিক রোজনামচা নয় বা শুধু আয়-ব্যয়ের হিসাব নয় বরং বাজেট একটি জাতির দিকদর্শন এবং দলিল। একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে এ দেশবাসী কি চায়, শ্রমজীবী মানুষ, হতদরিদ্র অসহায় মানুষ কি চায়, তাই বিনির্মাণের দলিল বিবৃত ও বিস্তৃত হওয়া উচিত জাতীয় বাজেটে।

বাজেট বাংলাদেশের জনগণের কাছে একটি ভীতিপ্রদ শব্দ। এ শব্দটি উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে ভোজ্যতেল, চাল, ডালসহ নিত্য প্রয়োজনীয় ও ব্যবহার্য পণ্য ও জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির কথা স্মরণ হয়। বাজেট ঘোষণার পর পরই গ্রামাঞ্চলের শ্রমজীবী মেহনতী সাধারণ মানুষও কৌতুহলী হন কোনো জিনিসের দাম কত বেড়েছে তা জানার জন্য। কেননা বাজেট ঘোষণার পর কখনো কোন জিনিসের

বাজেট শুধুমাত্র একটি হিসাব নিকাশের খাতা বা বাৎসরিক রোজনামচা নয় বা শুধু আয়-ব্যয়ের হিসাব নয় বরং বাজেট একটি জাতির দিকদর্শন এবং দলিল। একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে এ দেশবাসী কি চায়, শ্রমজীবী মানুষ, হতদরিদ্র অসহায় মানুষ কি চায়, তাই বিনির্মাণের দলিল বিবৃত ও বিস্তৃত হওয়া উচিত জাতীয় বাজেটে।

দাম কমেছে এমন অভিজ্ঞতা স্বাধীনতার পর থেকে অর্থাৎ ১৯৭২ সাল থেকেই নেই। প্রায় প্রতিটি বাজেট ঘোষণার পর পরই সকল ধরনের দ্রব্য-পণ্যের মূল্য কেবল বেড়েছে। কালে ভদ্রে যদি কোনো দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি না ঘটে, তবে আগের বছর যেটা বেড়েছে সেটাই হয়তো স্থির হয়ে থেকে গেছে। এটিই এদেশের শ্রমজীবী মানুষসহ সকল মানুষের গত ৫০ বছরের বাজেট অভিজ্ঞতা।

বাজেটের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়। কিন্তু আয় ও ব্যয় যেভাবে ধরা হয় তার যৌক্তিকতা বাস্তবতার নিরিখে প্রশ্নবিদ্ধ হয়। বছরের পর বছর এটি লক্ষ্যনীয়- রাজস্ব আয় বাড়ানোর উদ্দেশ্যে যতটা ধরা হয় তার চেয়ে বেশি ব্যয় হয়। সরকারের প্রশাসন পরিচালনাসহ বিভিন্ন অনুন্নয়ন ব্যয় যতটা ধরা হয় তার চেয়ে বেশি ব্যয় হয়। আর উন্নয়ন কর্মসূচি কাটছাট করা হয়। প্রকল্প সময়মতো বাস্তবায়ন করতে না পারার জন্য প্রশাসনের সক্ষমতার অভাব তথা অদক্ষতাকে বিশেষভাবে দায়ী করা হয়। কিন্তু পরিস্থিতির উন্নতিতে দিক নির্দেশনা তেমন থাকে না। রাজস্ব আদায়ে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে পিছিয়ে থাকা একটি সমস্যা। এ জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মীদের দায় অবশ্যই আছে। এর সঙ্গে জড়িত সরকারের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দর্শন। ধনবান জনগোষ্ঠীর ওপর প্রত্যক্ষ কর বাড়াতে না পারলে বাজেটের আকার অর্থনীতির বর্ধিত শক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রণয়ন করা যায় না। ফলে জনকল্যাণমূলক কাজ ও অবকাঠামো খাতে ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নের লক্ষ্য অপূর্ণ থাকে। কর্মসংস্থান সমস্যাও প্রকট হয়। বিশেষ করে শিক্ষিত যে বিপুল সংখ্যক গ্রাজুয়েট প্রতিবছরে শ্রম বাজারে প্রবেশ করছে, তাদের বিপুল অংশ মেধা যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ না পাওয়ায় হতাশায় ভুগছে।

বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী সমতা ভিত্তিক সমাজ গঠনের কথা বলেন। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে মুষ্টিমেয় কিছু সুবিধাভোগীর হাতে অঢেল সম্পদ জমা হচ্ছে, অন্যদিকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনমানে উন্নয়ন ঘটছে সীমিত পরিমাণে। এ অবস্থার পরিবর্তন করতেও দরকার সরকারের নতুন রাজনৈতিক দর্শন।

বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার শ্রমজীবী মেহনতী মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ধীরে হলেও ক্রমাগত বড়ো হচ্ছে ক্রমাগত এবং সে কারণে প্রতিবছর বাজেটের আকার আগের বছরকে ছাপিয়ে যাবেই। এটা কোনো রেকর্ড নয়। আত্মতুষ্টিরও কিছু নেই এতে।

শ্রমজীবী মানুষ ও রাষ্ট্রীয় বাজেট

শ্রম উৎপাদনের একটি মৌলিক উপাদান। শ্রম হচ্ছে আল্লাহর সেরা সৃষ্টি মানুষের একটি অবিচ্ছেদ্য শক্তি বা গুণ। শ্রমের প্রাপ্য হচ্ছে মজুরি। একজন শ্রমজীবীকে তার দৈহিক ও মানসিক শ্রম দানের বিনিময়ে চুক্তি মোতাবেক দেওয়া অর্থকে মজুরি বলে। উৎপাদকের নিকট মজুরি হলো উৎপাদন খরচ আর শ্রমজীবীর নিকট মজুরি হলো আয়।

শ্রমজীবীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং তার যথাযথ প্রাপ্য দেওয়ার জন্য ইসলাম কঠোর নির্দেশ দিয়েছে। হাদিসে কুদসিতে রাসূল (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ বলেন, তিনি কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তিকে কঠোরভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তাদের মধ্যে একজন হলো সে ব্যক্তি, যে অর্থের বিনিময়ে শ্রমিক নিয়োগ করে পুরো কাজ আদায় করে নিলো কিন্তু তার যোগ্য প্রাপ্য দিলো না' শ্রমিকের প্রাপ্য পারিশ্রমিক নিয়ে নিয়োগকর্তাদের বাহানা করা জুলুম

শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ ও মানব কল্যাণের জন্য কয়েকটি উপাদান অপরিহার্য বলে সকল চিন্তাবিদই একমত পোষণ করেন। এ উপাদানগুলো হচ্ছে:-

১. সর্বাধিক উৎপাদন নিশ্চিত করা;
২. সকল কর্মক্ষম মানুষের সম্মানজনক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;
৩. আয় ও সম্পদের সুষম ও সুবিচারপূর্ণ বণ্টন নিশ্চিত করা;
৪. সকল মানুষের মৌলিক বস্তুগত প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা বিধান করা;
৫. সমাজের সার্বিক নিরাপত্তা ও শান্তি নিশ্চিত করা;
৬. সৎ উপায়ে জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রত্যেকের সুযোগের নিশ্চয়তা থাকা;
৭. দারিদ্র দূরীকরণ;

জাতীয় বাজেটে এ বিষয়গুলোর বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকা দরকার। শ্রমজীবীদের জাগতিক ও পারলৌকিক উভয় জগতের কল্যাণ অর্জনে কুরআনিক অর্থনীতিতে মোটিভেশন সৃষ্টি করা হয়। এ জন্য বাজেটের মাধ্যমে দুনিয়ার হাসানা ও আখিরাতের হাসানা এ দুটোই কাম্য।

রিবা বা সুদ হারাম হওয়া ইসলামী অর্থনীতির একটি মৌলিক বিষয়। সুদ হারাম হলে গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই পরিবর্তিত হয়ে যায়। ইসলামী কল্যাণ অর্থনীতি সুদকে মূলোৎপাটিত করে বিনিয়োগ ও উৎপাদনকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছে। এ দেশের বাজেটের মাধ্যমে বিনিয়োগ ও উৎপাদনকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানের ব্যবস্থা করলে শ্রমজীবীরাই উপকৃত হবে।

তেলের দামে দিশেহারা শ্রমজীবীর পেঁয়াজের ঝাঁজে চোখে পানি। স্বশাসন চলছে বাজারে। বর্তমানে দেশের অন্যতম আলোচ্য বিষয় নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি। কয়েক মাস ধরে নিত্যপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে চরম বিপাকে পড়েছেন দেশের সাধারণ মানুষ। নিত্যপণ্য সামগ্রীর দাম বৃদ্ধিতে শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষের পাশাপাশি মধ্যবিত্তরাও দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। হু হু করে পণ্য সামগ্রীর দাম যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে জীবনধারণ কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে। দেশে নিত্যপণ্যের বাজার যে অস্থির হয়ে পড়েছে এবং অস্থির সে বাজারে প্রতিদিন যে অনেক পন্যের দাম শুধু বাড়ছেই এ তথ্যের পুনরুল্লেখ করার নিশ্চয়ই দরকার পড়ে না। বিগত বেশ কয়েক মাস ধরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং বেসরকারি টেলিভিশনসহ সকল গণমাধ্যমে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত রিপোর্ট নিয়মিতভাবে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়ে আসছে। এ কথা আজ অকাট্য সত্য যে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসহ প্রায় সকল প্রকার সামগ্রীর মূল্য আকাশচুম্বী হয়ে পড়েছে। এমন কোনো সামগ্রী নেই যার দাম কমেছে বলে শোনা যায়। যতই দিন অতিবাহিত হচ্ছে ততোই দাম কমার পরিবর্তে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে এবং এই মূল্য এমন এক পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে যে, সাধারণ মানুষ তার ক্রয় ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে।

একজন শ্রমজীবী অসহায় সাধারণ নাগরিকের ব্যক্তিগত আয়ের সাথে এই মূল্যবৃদ্ধির কোনো সামঞ্জস্য নেই। বাজারের অবস্থা এখন এমনি পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, বাজারের যে একটি স্বাভাবিক নিজস্ব

একজন শ্রমজীবী অসহায় সাধারণ নাগরিকের ব্যক্তিগত আয়ের সাথে এই মূল্যবৃদ্ধির কোনো সামঞ্জস্য নেই। বাজারের অবস্থা এখন এমনি পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, বাজারের যে একটি স্বাভাবিক নিজস্ব নিয়ম-কানুন থাকে তাও প্রায় ভেঙে পড়ার উপক্রম। একের পর এক মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কাই এখন বাজারের স্বাভাবিক নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থা দেশের সীমিত আয়ের শ্রমজীবী মানুষের জীবনে যে কিভাবে শোচনীয় পরিণতি ডেকে আনে তা বোধ করি না বললেও চলে। এ বারের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি কিন্তু বিগত দিনের সব রেকর্ড ছড়িয়ে গেছে। দেশজুরে চলছে হাহাকার, দেশের ৮০ভাগ মানুষ দ্রব্যমূল্যের কষাঘাতে জর্জরিত। অথচ সরকার শ্রমজীবী মানুষের বাঁচা-মরার সঙ্কটের মুহুর্তে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। জনদুর্ভোগের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে নিজেদের ক্ষমতা সংহত করার কাজেই সরকার ব্যস্ত।

নিয়ম-কানুন থাকে তাও প্রায় ভেঙে পড়ার উপক্রম। একের পর এক মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কাই এখন বাজারের স্বাভাবিক নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থা দেশের সীমিত আয়ের শ্রমজীবী মানুষের জীবনে যে কিভাবে শোচনীয় পরিণতি ডেকে আনে তা বোধ করি না বললেও চলে। এ বারের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি কিন্তু বিগত দিনের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। দেশজুড়ে চলছে হাহাকার, দেশের ৮০ভাগ মানুষ দ্রব্যমূল্যের কষাঘাতে জর্জরিত। অথচ সরকার শ্রমজীবী মানুষের বাঁচা-মরার সঙ্কটের মুহূর্তে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। জনদুর্ভোগের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে নিজেদের ক্ষমতা সংহত করার কাজেই সরকার ব্যস্ত।

বাজার ব্যবস্থায় যেন পুঁজিবাদ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। নিত্যপণ্যের দামের উর্ধ্বমুখী প্রবনতার জন্য করোনা মহামারীতে উৎপাদন কমে যাওয়া, বিশ্ববাজারে অস্থিরতা, অতিরিক্ত আমদানি নির্ভরতা, সরকারের আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত ও সুযোগ সন্ধানী ব্যবসায়ীদের কারসাজিকে দায়ী করেছেন বাজার সংশ্লিষ্টরা। আবার কেউ কেউ অভ্যন্তরীন বাজারের সুশাসনের প্রভাবকেও দায়ী করেছেন। কালোবাজারী, মজুতদার, মুনাফাখোরদের দৌরাত্মকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে বাজার নিয়ন্ত্রন বা শাসনের ক্ষমতা সরকারের হাতে নেই বরং বাজারে এখন প্রকারান্তরে শাসন চলছে; বাজারই বাজার নিয়ন্ত্রন করছে। আর নেপথ্যের কুশীলব ভূমিকা পালন করছেন কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ও বাজার সিন্ডিকেট।

ধনীরা আরও ধনী হয়ে উঠছে আর সাধারণ খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষেরা কোনোরকমে খেয়ে পরে জীবনের সাথে নিত্য যুদ্ধ করে চলেছে। এ যুদ্ধ যেন থামবার নয়। বৈষম্য ক্রমেই বেড়ে চলেছে, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে শ্রমজীবী সাধারণ জনগণ এবারের বাজেট পেশের আগেই সীমাহীন ভোগান্তিতে আছে।

বাংলাদেশে প্রতিটি বাজেট ঘোষণার আগে ও পরে জিনিসপত্রের দাম বাড়ে। রমাদ্বান এলেও জিনিসপত্রের দাম বাড়ে। বাজারে পন্যদ্রব্য নেই, তেমন অবস্থা নয়। সবকিছুই আছে, তবে দাম বেশি। বলা যায় শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের হাতে জিম্মি। নিম্ন আয়ের মানুষ ভালো নেই। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি বর্তমানে দেশের জাতীয় সমস্যগুলোর অন্যতম। অধিকাংশ নিত্যপন্যের মূল্যই এখন নিম্ন আয়ের শ্রমজীবী মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। বিশেষ করে দিন আনা দিন খাওয়া শ্রমজীবী মানুষগুলোর জীবনে পড়েছে হতাশার চাপ। যেন সংসার চালানো দায় হয়ে পড়েছে। এমন দামের কারণেই একেবারে বেসামাল শ্রমজীবী মানুষ। তাদের ব্যয় বাড়লেও, বাড়ছেনা আয়। ফলে সংসার চালাতে হাঁসফাঁস উঠেছে তাদের। মানুষের আয় কমেছে। সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ড. এ বি মির্জা আজিজুল ইসলাম বলেছেন, দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা করতে হলে মানুষের ব্যয় বাড়াতে হয়। আর ব্যয় বাড়ানোর জন্য আগে আয় করা দরকার। কিন্তু করোনা মহামারী, কর্মসংস্থান না থাকা, দুর্নীতির সার্বজনীনতায় দেশের মানুষের বড় একটি অংশের আয় কমেছে। বাংলাদেশে যারা শ্রমজীবী মানুষ, তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, তারাই ব্যাপক জনগোষ্ঠী। এই ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে দেশের উন্নয়নের কথা ভাবা যায় না। সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের কাজটি তেমন অগ্রসর হয়নি। কথা ও কাজে গলদ আছে এটি সুস্পষ্ট।

ইসলামী কল্যাণ অর্থনীতিতে মনোপলি, কার্টেল, অলিগোপালি (Oligopaly), ডাম্পিংকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মজুদদারী, মুনাফাখোরি, কালোবাজারি ইসলামে নিষিদ্ধ, আর তা মানুষের কল্যাণের জন্য।

মুসলিম কল্যাণ রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো দারিদ্র দূর করা। একই সাথে দেশ থেকে সর্বপ্রকার দুর্নীতি দূর করা। এজন্য প্রয়োজন শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বস্তরে নৈতিকতার বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা। এ বিষয়গুলো জাতীয় বাজেট প্রণয়নের সময় খেয়াল রাখা দরকার।

এখন তথাকথিত উন্নয়ন নয়, বরং বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা। সুতরাং অত্যন্ত জরুরী খাতের ব্যয় বাড়িয়ে অন্যান্য কম জরুরী এমনকি দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন খাতে ব্যয় কমিয়ে জনগণকে সহযোগিতা করতে হবে এবং বাজেট ঘাটতি কমিয়ে আনতে হবে। জনপ্রশাসন খাতে ব্যাপক বাজেট বরাদ্দ কমিয়ে স্বাস্থ্য, কৃষি এবং সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ব্যয় বাড়াতে হবে। জাতীয় বাজেটে (২০২০-২১) জনপ্রশাসনে বরাদ্দ অনেক বেশি ছিল, তা মোট বাজেটের ৩২ শতাংশ ছিল। এমনকি প্রতিরক্ষা এবং আইনশৃঙ্খলার বরাদ্দ হিসেবে এ খাতে বরাদ্দ প্রায় ৪২ শতাংশ ছিল। এ ক্ষেত্রে বরাদ্দের প্রবৃদ্ধি ২৯ শতাংশ ছিল, অথচ জনপ্রশাসন খুবই ছোট সেক্টর।

২০২০-২০২১ এর জাতীয় বাজেটে ১০ হাজার কোটি টাকা থাকে বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। এ খাতে বরাদ্দ আসলে লুটপাটের বরাদ্দ, এটা দেশের কোনো উপকারে আসে না।

প্রতিবছরেই পরোক্ষ করের আওতা বৃদ্ধি করা হয়। ফলে অধিকাংশ করের বোঝা শ্রমজীবী সাধারণ মানুষকেই বহন করতে হয়। এতে দেশে বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশের এখন এক নম্বর সমস্যা চাঁদাবাজি, দুর্নীতি ও সন্ত্রাস। শীর্ষ সন্ত্রাসীদের দাবিকৃত মোটা অংকের চাঁদা দিতে ব্যত্যয় ঘটলেই ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা, কারখানা মালিকরা সন্ত্রাসী হামলার শিকার হচ্ছে। চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসের কারণে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। বিদেশী বিনিয়োগ ব্যাহত হচ্ছে এই চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসের কারণে। একটি সেমিনারে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে বাংলাদেশে শিল্প স্থাপন করা হচ্ছে সবচেয়ে বড় পাপ। এ পাপের মাসুল দিতে এ দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কর্মরত বুদ্ধিমান ও চালাক-চতুর শিল্পপতিরা বর্তমানে স্থানীয় শিল্প বন্ধ করে দিয়ে বিদেশী পণ্যের একচেটিয়া আমদানীকারকে পরিণত হচ্ছেন এবং দেশে তৈরীর পরিবর্তে ঐসব পণ্য বিদেশ থেকে আমদানি করাই এখন সর্বাধিক লাভজনক বলে বিবেচনা করছেন। এ কারণে দেশে নতুন শিল্প কারখানা স্থাপনের পরিবর্তে অবশিষ্ট, ঐতিহ্যবাহী পুরানা শিল্প-কারখানাগুলোও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এজন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি বন্ধে সুনির্দিষ্ট কর্মকৌশল গ্রহণ করতে হবে।

ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার চেয়ে দেশের যাকাত উত্তোলণ/আদায় করে সামাজিক নিরাপত্তাসহ বাজেটের যাকাতযোগ্য খাতে সাপোর্ট দেওয়া যেতে পারে। দেশে ট্যাক্স ক্রেডিট পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে। এ পদ্ধতিটি হলো, যাকাতকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া এবং ব্যক্তি যে পরিমাণ যাকাত দেবে, সে পরিমাণ টাকা ট্যাক্স থেকে কম নেওয়া। এতে ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার প্রবনতা কমবে। এ ছাড়াও শ্রমজীবী ও কৃষকদের প্রনোদনা এবং ভোক্তাদের যাকাতের আওতায় আনা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র:

১ সহীহ বুখারী।

২ সহীহ বুখারী, মুসলিম।

৩ নিত্যপণ্যের বাজারে আগুন, অর্থনৈতিক রিপোর্টার, দৈনিক ইনকিলাব, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২, পৃ.১২

লেখক: অর্থনৈতিক বিশ্লেষক ও ব্যাংকার।

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষ্যে দ্বি-মাসিক শ্রমিক বার্তার মুখোমুখি হয়েছেন -

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান
ভারপ্রাপ্ত সভাপতি
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

শ্রমিক বার্তা: আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসে আপনার মূল্যায়ন কি ? যে উদ্দেশ্যে শিকাগোতে শ্রমিকরা জীবন দিয়েছিলো তার কতটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে ?

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান: আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস শ্রমিকদের উজ্জীবিত করে। শ্রমিকরা এ দিনে আমেরিকার শিকাগো শহরে অধিকারের জন্য জীবন দিয়েছিলো, তাদের স্মরণে আমরা এই দিন বিশেষভাবে উদযাপন করি এবং শ্রমিকের সমস্যা সমাধানের জন্য এই দিন থেকে প্রেরণা গ্রহণ করি। এ দিবসটি পালন করে শ্রমিকরা একটু আনন্দ লাভ করে। তাদের মনের কথা তারা প্রকাশ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্য শুধুমাত্র বছরের এই এক দিন যেন শুধু শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের জন্য নির্ধারিত। দিবসটি চলে গেলে শ্রমিক সংগঠনগুলোকে সক্রিয় হতে দেখা যায় না। কিন্তু শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের বিষয়টি এক দিনেরই নয়, বরং সব সময়ের জন্য চলমান থাকতে হবে। তাহলেই শ্রমিকের অধিকার আদায় হবে। শুধু একটি দিবস পালন করেই শ্রমিকের অধিকার আদায় সম্ভব নয়। শ্রমিকেরা সে আন্দোলন করেছিলো দৈনিক আট কর্মঘণ্টা নির্ধারণ করার জন্য। কিন্তু বর্তমানে শ্রমিকদের অনেক সমস্যা। আট ঘণ্টা এখন আর সমস্যা নেই বরং শ্রমিকরা আরও বেশি কাজ করতে চায়। কেননা ঘরে ঘরে আজ বেকার। শিক্ষিত ছেলেরা বেকার হয়ে বসে আছে। সে সময়ে শ্রমিকদের চাকুরি, বেতন ছিলো। শুধু সময়টা ছিলো বেশি। এ ব্যাপারে তাদের অভিযোগ ছিলো।

শ্রমিক বার্তা: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক শ্রমদিবসের গুরুত্ব কতটুকু ?

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শ্রমিক দিবসের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা আমাদের দেশের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ শ্রমিক। আমরা এই দিবসটি পালন করলেও এই দিবসের গুরুত্ব যথাযথভাবে দিতে ব্যর্থ হয়েছি। আসলে আমেরিকা, ব্রিটেনেও এ দিবসটি ঘটা করে পালন করা হয় না। বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে এ দিবসগুলো পালন করা হয়। কিন্তু এর মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের চিন্তা ভাবনা ও শ্রমিকদের কল্যাণে গবেষণার অভাব রয়েছে আমাদের দেশে।

শ্রমিক বার্তা: বাংলাদেশে শ্রমিকদের সংগঠনগুলোকে ঐক্যবদ্ধ দেখা যায় না। শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করতে আপনাদের সংগঠনের ভূমিকা কি ?

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান: শ্রমিকদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য যে নীতিমালা দরকার বাংলাদেশে সেই নীতিমালা নেই। শ্রমিক সংগঠনগুলো কেউ ধর্মনিরপেক্ষ, কেউ সমাজতন্ত্র আদর্শে বিশ্বাসী। এ মত পার্থক্যের কারণে শ্রমিকদের মধ্যেও মত পার্থক্য আছে। ফলে এক শ্রমিক ভালো কথা বললেও অন্যরা সেটা গ্রহণ করতে চায় না। ফলে শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারছে না। ফলে শ্রমিকদের দাবি আদায় হচ্ছে না। বাংলাদেশে এখনো এমন সংগঠন তৈরি হয়নি যার নিচে সবাই স্থান পেতে পারে। আইএলও থেকে যারা অনুমোদন পেয়েছে তারাও শ্রমিকদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেন না বিভিন্ন দর্শন ও সংকীর্ণতার কারণে। আমাদের সংগঠনের ভূমিকা হলো, আমরা মনে করি মানুষকে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের কিভাবে কল্যাণ হবে তা কেবল মাত্র আল্লাহ তা'য়ালাই জানেন। রাসূল (সা.) শ্রমিকদের জন্য যে নীতিমালা ঠিক করেছে সে নীতিমালা বাস্তবায়ন হলে সকল শ্রেণির শ্রমিকরা তাদের অধিকার লাভ করতে পারে। যেমন রাসূল (সা.) মালিককে বলেছেন, তুমি যা খাও তোমার শ্রমিককেও তা খেতে দাও, তুমি যা পড়ো, তোমার শ্রমিককেও তা পড়াও। রাসূল (সা.) আরও বলেছেন, শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগেই তার পারিশ্রমিক প্রদান করো। এর চেয়ে উত্তম নীতিমালা আর কি হতে পারে ? কিন্তু দুর্ভাগ্য শ্রমিকদের এসব কথা বলা হয় না। অথচ রাসূল (সা.) এর মত উত্তম নীতিমালা পৃথিবীর কোন শক্তি বা ব্যক্তি উত্থাপন করতে পারেনি। এটা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি। রাসূল (সা.) তাঁর শ্রমিক যায়েদ (রা.) কে ভাই হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। শ্রমিকদের সন্তানদেরকে আপন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। শ্রমিকদের সামান্যতম অধিকার ক্ষুন্ন করা আখেরাতে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে কঠিন জবাবদিহীর কথা স্বরণ করিয়ে দিয়েছেন। পৃথিবীর কোন নেতা তার শ্রমিককে ভাই হিসেবে গ্রহণ করতে পারেনি। শ্রমিকের অধিকার পৃথিবীর কেউ এভাবে দিতে পারেনি। শ্রমিকের কল্যাণ চাইলে রাসূল (সা.) এর নীতির উপরে সবাইকে চলতে হবে। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রাসূল (সা.) এর নীতিমালার উপরই কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের ৯০ভাগ শ্রমিক মুসলমান। সুতরাং সকল শ্রমিক ও শ্রমিক সংগঠন রাসূল (সা.) এর নীতিমালার উপর ঐক্যবদ্ধ হলেই শ্রমিকের অধিকার আদায় সম্ভব। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কোন সস্তা স্লোগানের উপর নয় বরং রাসূল (সা.) এর নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত।

শ্রমিক বার্তা: বাংলাদেশের শ্রমিক সংগঠনগুলো কি শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে ঠিক ভূমিকা রাখছে বলে আপনি মনে করেন ?

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান: না। বাংলাদেশের বেশিরভাগ শ্রমিক

সংগঠনগুলোর সাথে সরকার, এনজিও ও মালিকের সাথে হাত আছে। তারা একেক সময় একেক কথা বলে। আসলে চরিত্রহীন নেতৃত্বের কুফল শ্রমিকরা ভোগ করছে। প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকের কল্যাণ রাসূল (সা.) এর নীতিমালার উপরই রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে এটি বাস্তবায়ন হচ্ছে না। সরকারে যারা থাকে তারা নিজেদের শ্রমিক সংগঠন দিয়ে শ্রমিক ময়দানে প্রভাব বিস্তার করে ও শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে শ্রমিকরাও দিশেহারা।

শ্রমিক বার্তা: আপনি কি মনে করেন এদেশের শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী পায় ? একজন শ্রমিকের মজুরি কত হওয়া উচিৎ ?

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান: রাষ্ট্রীয়ভাবে শ্রমিকদের জন্য কিছু নীতিমালা রয়েছে। কিন্তু সে নীতিমালা সরকার বা মালিকপক্ষ কেউই মানে না। ফলে শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য মজুরি পায় না। কাজও বেশি সময় করে। শুধু একজন শ্রমিককে নিয়ে ভাবলে হবে না। একজন শ্রমিকের পরিবার নিয়ে বেঁচে থাকার বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে। শ্রমিকদের যত ভালো রাখবে মালিক ও দেশের তত উন্নয়ন হবে। কিন্তু মালিকরা তা বুঝতে চায় না। বরং শ্রমিকদের ঠকাতে ব্যস্ত থাকে মালিকরা। একজন শ্রমিকের মজুরি হওয়া উচিত ন্যূনতম ২০ হাজার টাকা।

শ্রমিক বার্তা: বর্তমান যে শ্রম আইন ও শ্রমনীতি তা দ্বারা কি শ্রমিকের প্রকৃত কল্যাণ ও অধিকার আদায় কি সম্ভব ?

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান: আইএলও'র কিছু নীতিমালা আছে। কিন্তু সরকার তা মেনে চলে না। সরকারও লোক দেখানো নীতিমালা করে যা বাস্তবায়ন হয় না। শ্রমিক নেতারাও টাকা খেয়ে চুপ থাকে। যতটুকু নীতিমালা আছে সেটুকু বাস্তবায়ন করলেও শ্রমিকরা কিছুটা ভালো থাকত। কিন্তু তা বাস্তবায়ন হয় না।

শ্রমিক বার্তা: শ্রমিকের অধিকার আদায় ও ন্যায্য পাওনা আদায়ে শ্রমিক সংগঠনগুলোর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন আছে কি না ?

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান: শ্রমিক সংগঠনগুলো ঐক্যবদ্ধ হলেই কেবল শ্রমিকদের অধিকার আদায় ও ন্যায্য মজুরি আদায় হবে। শুধু শ্রমিকই নয় বরং শ্রমিক সংগঠনগুলো ঐক্যবদ্ধ হলে বাংলাদেশে গণতন্ত্র ব্যাহত হতে পারে না। রাজনৈতিক অধিকারও আদায় হতে পারে। এ জন্য সবাইকে আলাপ আলোচনা করে ঐক্যবদ্ধভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। অন্তত শ্রমিকের বেতন ভাতাসহ মৌলিক নীতিমালার জন্য সবাই একসাথে বসে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দলীয় সংকীর্ণতার কারণে একে অপরের সাথে বসতে পারে না। এভাবে শ্রমিকের অধিকার আদায় করা যাবে না। শ্রমিকের অধিকার আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া উপায় নেই। আমি সকলের কাছে আহ্বান করব, আসুন সব দল মতের ঊর্ধ্বে উঠে শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে সরকারকে বাধ্য করি।

শ্রমিক বার্তা: শ্রমিকের অধিকার আদায়ে একজন শ্রমিক নেতার ভূমিকা কেমন হওয়া উচিৎ বলে আপনি মনে করেন ?

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান: একজন শ্রমিক নেতা শুধু শ্রমিকের অধিকার নিয়েই চিন্তা করবে। রাজনৈতিক বা অন্য কোন চিন্তা করতে পারবে না। দেশের কল্যাণের কথাও মাথায় থাকতে হবে। শ্রমিকমুখি শ্রমিক নেতা হতে হবে।

শ্রমিক বার্তা: রাষ্ট্রায়াত্ত কলকারাখানা দিন দিন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এর কারণ ও সমাধান কি হতে পারে ?

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান: ব্যক্তিগত মিল কারখানা উৎসাহিত করা দরকার। কারণ রাষ্ট্রায়াত্ত মিল কারাখানাগুলো সরকার চালানোর কথা থাকলেও তারা তা চালায় না। সরকার যাদের নিয়োগ করে তারা দুর্নীতিপরায়ন। তারা মিল কারখানাগুলো ধ্বংস করে দেয় দুর্নীতি ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে। এ ধারা বহুদিন থেকেই চলে আসছে। তারা শেষ পর্যন্ত এসব মিল কারাখানাগুলোকে দেওলিয়া করে দেয় বিশেষ ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। তবে সৎ ও দক্ষ নেতৃত্ব হলে ভিন্ন কথা। এক্ষেত্রে বেসরকারিভাবে ছেড়ে দিলেই ভালো। তুর্কিতে এমনই হচ্ছে এবং ভালো ফল পাচ্ছে। এক্ষেত্রে মালিক-শ্রমিককে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

শ্রমিক বার্তা: শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ে আপনার সংগঠনের ভূমিকা কি ?

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান: আমাদের প্রথম কথা হলো মালিক-শ্রমিক ভাই ভাই। শ্রমিক মালিককে ঠকাবে না। মালিক শ্রমিককে ঠকাবে না। রাসূল (সা.) বলেছেন, কেউ যদি শ্রমিককে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আমাদের দেশে মালিকরা শ্রমিকদেরকে ভাই হিসেবে মেনে নিতে পারেনি। তারা শ্রমিকদেরকে হীন মনে করে। নিজেদেরকে তারা বড়ো ও অভিজাত মনে করে। এ মন-মানসিকতা নিয়ে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে না। মালিক-শ্রমিকের সম্পর্ক হবে রাসূল (সা.) এর নীতির ভিত্তিতে। শ্রমিকদের কোনভাবেই ঠকানো যাবে না। মালিকেও ক্ষতি করা যাবে না। এ নীতির উপরই আমরা কাজ করছি। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মালিক-শ্রমিক উভয়কেই এই নৈতিকতা শেখানোর চেষ্টা করছে। অধিকার আদায়ে আমাদের নীতি হলো আলোচনার মাধ্যমে সব সমাধান করা। মালিকের সম্পদের ক্ষতি করে আমরা কোন আন্দোলন করতে চাই না। আমরা ন্যায়, নীতি, সমাঝোতা ও মালিক-শ্রমিকের ভ্রাতৃত্বে ভিত্তিতে অধিকার আদায় ও দায়িত্ব পালন করতে চাই। এটাই আমাদের নীতিমালা। এ নীতিমালায় সবাই একমত হলে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠন সম্ভব হবে।

শ্রমিক বার্তা: আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান: ধন্যবাদ আপনাকে।

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষ্যে দ্বি-মাসিক শ্রমিক বার্তার মুখোমুখি হয়েছেন -

এ এম ফয়েজ হোসেন

সাধারণ সম্পাদক

বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন

শ্রমিক বার্তা: আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসে আপনার মূল্যায়ন কি ? যে উদ্দেশ্যে শিকাগোতে শ্রমিকরা জীবন দিয়েছিলো তার কতটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে ?

এ এম ফয়েজ: মে দিবসের আত্মত্যাগ বিফলে যায়নি। যে ১২ জন মানুষ জীবন দিয়েছিলো তার প্রেক্ষিতে সারা দুনিয়াতে নতুন করে আন্দোলন সংগ্রাম শুরু হয়। এ দিবসটি সারা দুনিয়াতে পালনের সিদ্ধান্ত হয়। শ্রমিকদের ত্যাগ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়। শ্রমিকদের জন্য এটা একটা বিশাল বিজয়। ঐদিনের আত্মত্যাগ না হলে শ্রমিকদের ৮ ঘণ্টা শ্রম, ৮ ঘণ্টা বিশ্রাম, ৮ ঘণ্টা বিনোদনের অধিকার আদায় সহজ হতো না। বর্তমানে শ্রম ঘণ্টা আরও কমে গেছে। বাংলাদেশে রয়েছে দুদিন ছুটি। এটা তারই ধারাবাহিকতা। শিকাগোতে শ্রমিকদের আন্দোলনের তাৎক্ষণিক সফলতা ছিলো না বরং ছিলো উল্টো। তখন কাউকে খুন করা হয়েছে। কাউকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ আন্দোলনের দীর্ঘ মেয়াদী ফলাফল ছিলো। যা আজও অব্যাহত আছে।

শ্রমিক বার্তা: সারা পৃথিবীর ন্যায় আমাদের দেশেও এ দিবসটি ঘটা করে পালন করা হয়। বাংলাদেশে প্রেক্ষাপটে এর গুরুত্ব কতটুকু?

এ এম ফয়েজ: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আরও বেশি গুরত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের শ্রমিকদের অবস্থা দাস যোগের মতই। বিশেষ করে গ্রার্মেন্টস শ্রমিকরা ১৪ ঘণ্টা কাজ করেও জীবন চালানো কঠিন হয়ে গেছে। বাংলাদেশে ৮ ঘণ্টা কাজ করে সংসার চালানোর অবস্থা সৃষ্টি করা জরুরি। যদিও বিভিন্ন সংগঠন দিবসটি ঝাঁকজমক করে পালন করে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শ্রমিকদের তেমন কোন উপকার হয় না।

শ্রমিক বার্তা: বাংলাদেশের শ্রমিক সংগঠনগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করতে আপনার সংগঠনের ভূমিকা কি ?

এ এম ফয়েজ: আমরা সারা দুনিয়াতে শ্রমিক শ্রেণির ঐক্য চাই। বাংলাদেশে একটি শ্রমিক ফেডারেশনই যথেষ্ট ছিলো। কিন্তু এখানে ব্যাঙ্গের ছাতার মত চল্লিশটি শ্রমিক সংগঠন গড়ে উঠেছে। এগুলো অনৈক্যের ফল। ব্যক্তিগত খায়েস থেকে এ সংগঠনগুলো গড়ে উঠেছে। প্রথমে যারা শ্রমিক সংগঠন করে ছিলো তাদের একটি আদর্শ ছিলো। পরে আর সমন্বয় গড়ে উঠেনি। মালিকরা প্রকাশ্যে বলে, বেশিরভাগ শ্রমিক সংগঠন আমাদের দালাল। যদিও আন্দোলন সংগ্রামও রয়েছে। বেশিরভাগ শ্রমিক আন্দোলনই কার্যকর আন্দোলন করেছে এমন ইতিহাস নাই। অন্যদিকে রাষ্ট্র ট্রেড ইউনিয়ন নিরুৎসাহিত করে। ২০০৬ সালে সরকার শ্রম আইন করলেও তার উপকারিতা শ্রমিকরা পাচ্ছে না। বরং এখন বিনা নোটিশে ছাঁটাই করা যায়। বিনা নিয়োগপত্রে শ্রমিকদের কাজ করানো যায়। ফলে দীর্ঘ সময় কাজ করে শ্রমিকরা যখন অবসরে যায় তখন তাদের পাওনা তেমন কিছু থাকে না। এটি শুধু গার্মেন্টস শ্রমিকদের ক্ষেত্রে নয়। বরং সংবাদপত্রসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রেই রয়েছে। বড়ো বড়ো সংবাদপত্র প্রভিনেন্ড ফান্ড খেয়ে ফেলে। বিনা নোটিশে ছাঁটাই করে। বকেয়া পর্যন্ত দেয় না। আমাদের প্রচেষ্ট হলো, আমরা উন্মুক্ত। আমরা চাই সকলকেই ঐক্যবদ্ধ করতে। যদিও চাইলেই সব হয় না। এখানে রাজনৈতিক, আদর্শিক পার্থক্য আছে। আদর্শিক কারণে মাঠ লেভেলে মামলা দেওয়া হয়। ফলে অনেকেই গা বাচানোর চেষ্টা করে। মালিকপক্ষও এটা চাই। ফলে ট্রেড ইউনিয়নের যে কাঙ্ক্ষিত অবস্থান ছিলো তা না হয়ে দালালির বিষয়টি এগিয়ে এসেছে। তবে আমরা চেষ্টা করছি একটি শ্রমিক ঐক্য গড়ে তুলতে। যদিও এ প্রচেষ্টাও হুমকি আসছে। সকল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও শ্রমিক শ্রেণি ঐক্যবদ্ধ হবে। একটি পরিবর্তন হবে।

শ্রমিক বার্তা: একজন শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি কত হওয়া উচিৎ ?

এ এম ফয়েজ: একজন শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি রাষ্ট্র নির্ধারণ করছে না। শ্রমিকের মজুরি নির্ধারনে শ্রমিকের পরিশ্রম ও পরিবারের অবস্থার উপর নির্ধারণ করতে হবে। এসব গবেষণা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বলেছেন শ্রমিকের মজুরি ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা হওয়া উচিত। তবে বিভিন্ন বোর্ডগুলো যে মজুরি নির্ধারণ করে তা কোন রকমে বেঁচে থাকার মজুরি। এটা ন্যায্য মজুরি না। তারা যা নির্ধারণ করে তার থেকে ৩ থেকে ৪ গুণ বেশি হওয়া জরুরি। বর্তমানে দ্রব্যমূল্যের বাজারে আরও বেশি হওয়া জরুরি। বাস্তবতা হলো অপর্যাপ্ততার মধ্যেই শ্রমিকদের চলতে হচ্ছে। মালিকদের সক্ষমতা যতই বৃদ্ধি হোক না কেন তারা ন্যায্য মজুরি কখনোই দেয় না। এখানে পুরোটাই শোষণ চলছে। কারণ এরা সব জায়গা থেকেই এরা মুনাফা করতে চায়। দেশে জাতীয় ন্যূনতম নূন্যতম মজুরি নেই। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মনে করে ২৫ হাজার ৫ শত টাকা হলে বেঁচে থাকার মত একটি মজুরি হয়।

শ্রমিক বার্তা: বর্তমান শ্রম নীতিমালায় শ্রমিকদের এ মজুরি পাওয়া সম্ভব কি না ?

এ এম ফয়েজ: ২০০৬ সালের শ্রম আইনের পরতে পরতে শ্রমিকের স্বার্থ বিরোধী ধারা রয়েছে। ফলে এ নীতিমালা দিয়ে কখনোই শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা আদায় সম্ভব না। আমরা প্রস্তাব করেছি শ্রম আইন আরও স্পষ্ট ও যুগোপযোগী করতে হবে।

শ্রমিক বার্তা: শ্রমিকের ন্যায্য দাবী আদায়ে শ্রমিক সংগঠনগুলোর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন আছে কি না? কিভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে?

এ এম ফয়েজ: অবশ্যই প্রয়োজনীয়তা আছে। আমরা যখন শ্রমিকের স্বার্থ নিয়ে কথা বলি তখন সবাই একমত। কিন্তু যখনই নেতৃত্বের প্রশ্ন আসে তখন আবার আলাদা হয়ে যায়। একটি ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন প্রয়োজন। এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় নির্ধারণ করেও ঐক্যবদ্ধ হওয়া যায়।

শ্রমিক বার্তা: শ্রমিকদের অধিকার ও ন্যায্য দাবী আদায়ে একজন শ্রমিক নেতার ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত ?

এ এম ফয়েজ: নিয়ম হলো সেবায় নেতৃত্ব লাভ হবে। কিন্তু এখানে হয় উল্টো। এখানে আমি কি হনুরে একটা ভাব থাকে নেতাদের মাঝে। একজন শ্রমিক নেতার মাঝে শ্রমিকদের স্বার্থ আদায় ও সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা রাখার যোগ্যতা থাকতে হবে। শ্রমিকদের প্রতিদিনের জীবন যাপনের বিষয়টিও শ্রমিক নেতার নখদর্পণে থাকতে হবে।

শ্রমিক বার্তা: রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এর সমাধান কিভাবে হতে পারে ?

এ এম ফয়েজ: পথ একটিই। সৎ, স্বচ্ছতা থাকতে হবে। তা না হলে কিছুতেই লাভ হবে না। এস শিল্প কারখানায় বেড়ার ক্ষেত খায়। এ অবস্থায় কিছুতেই লাভজনক হবে না। আমাদের রাষ্ট্রায়াত্ত কলকারখানাগুলোকে বিরাষ্ট্রীয়করণে সাম্রাজ্যবাদী পলিসির কারণে প্রতিষ্ঠিত চিনিকল, পাটকল ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। ধাপে ধাপে দুর্নীতির মাধ্যমে নামকরা কলকারখানাগুলো ধ্বংস করা হয়েছে। যেমন চিনিকলগুলো ধ্বংস হওয়ার কোন কারণ নেই। বরং আরও এটিকে কেন্দ্র করে অর্থনীতি আরও সমৃদ্ধ হওয়ার কথা। কিন্তু ষড়যন্ত্র ও দুর্নীতির মাধ্যমে সুপরিকল্পিতভাবে সব রাষ্ট্রায়াত্ত কলকারখানাগুলো ধ্বংস করা হচ্ছে। পুঁজিবাজী ও পুঁজিপতিদের বিরাষ্ট্রীয়করণ পলিসি জাতির জন্য বিরাট ক্ষতিকর। কিন্তু সব চোখের সামনে হলেও আমরা কিছুই করতে পারছি না। এটি সমাধানের পথ হলো একটি বিপ্লবের পথ। তবে বিপ্লবের ডাক দেওয়ার সময় এখনো হয়নি। আমাদের আরও প্রস্তুতি নিতে হবে।

শ্রমিক বার্তা: শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে আপনাদের ভূমিকা কি ?

এ এম ফয়েজ: আসলে আমাদের ভূমিকা এখন কমে আসছে। যখন পঞ্চাশ বছর আগে আমরা যখন শ্রমিক ফেডারেশন গড়ে তুলি তখন আমাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিলো। বড়ো বড়ো নেতারা এখানে সম্পৃক্ত ছিলো। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে এ মোড় ঘুরে যায়। নেতাদের গ্রেপ্তার নির্যাতন করা হয়। তখন টিকে থাকাই কঠিন ছিলো। তবে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে এবং থাকবে ইনশাআল্লাহ। এক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কোন বিকল্প নেই। তাই নৈতিক শিক্ষার বিষয়টি এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে। একা অবস্থায় কোন কিছুই সম্ভব নয়। আমরা চেষ্টা করছি।

শ্রমিক বার্তা: আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

এ এম ফয়েজ: ধন্যবাদ আপনাকে।

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষ্যে দ্বি-মাসিক শ্রমিক বার্তার মুখোমুখি হয়েছেন -

মোঃ বাহারানে সুলতান বাহার
সভাপতি
জাগো বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন

শ্রমিক বার্তা: আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসে আপনার মূল্যায়ন কি ? শিকাগোতে শ্রমিকদের আত্মত্যাগের কতটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে ?

বাহারানে সুলতান বাহার: কিঞ্চিত পরিমান বাস্তবায়ন হয়েছে। শ্রমিকদের যে চাহিদা তা আমরা পূরণ করতে পারিনি। পালনের জন্য আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালন হচ্ছে। এ ছাড়া আর কিছু নেই।

শ্রমিক বার্তা: সারা বিশ্বে দিবসটি ঘটা করে পালন করা হয়। বাংলাদেশে এর গুরুত্ব কতটুকু ?

বাহারানে সুলতান বাহার: করার জন্য করছি। বাস্তবতা হলো শ্রমিকদের জন্য কাজ করতে হবে। সরকারকেও করতে হবে আমাদেরকেও করতে হবে।

শ্রমিক বার্তা: শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করতে আপনাদের ভূমিকা কি ?

বাহারানে সুলতান বাহার: আমরা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আহবান করে যাচ্ছি। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, নেতা নেতা ভাগ হও, শ্রমিকদের ঐক্য কর। এটাই আমাদের স্লোগান। আমরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

শ্রমিক বার্তা: বাংলাদেশের শ্রমিক সংগঠনগুলো কি শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে সঠিক ভূমিকা রাখছে ?

বাহারানে সুলতান বাহার: আমি মনে করি না। এ মন-মানসিকতা নেই।

শ্রমিক বার্তা: এদেশের একজন শ্রমিকের মজুরি কত হওয়া উচিত ?

বাহারানে সুলতান বাহার: এটা ক্ষেত্র বিশেষে ভিন্ন হবে। একদিকে বেতন বৃদ্ধি হচ্ছে আবার দৈনন্দিন জীবনের ব্যয়ও বাড়ছে।

শ্রমিক বার্তা: বর্তমান শ্রম আইন ও নীতিমালা দ্বারা শ্রমিকদের ন্যায্য আয় ও অধিকার আদায় সম্ভব কি না ?

বাহারানে সুলতান বাহার: এ বিধিমালা শ্রমিকের কল্যাণে আসছে না। এ আইনের কারণে উল্টো গার্মেন্টস মালিকরা শ্রমিকদের সহজে অত্যাচার করতে পারছে। আমি তার প্রতিবাদ করছি। এ আইন দ্বারা ন্যায্য দাবী আদায় সম্ভব নয়।

শ্রমিক বার্তা: শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে শ্রমিক সংগঠনগুলোর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন আছে কি না ? এবং সেটা কিভাবে ?

বাহারানে সুলতান বাহার: অবশ্যই প্রয়োজন আছে। ইস্যুভিত্তিক ঐক্য হতে পারে।

শ্রমিক বার্তা: শ্রমিকদের দাবি আদায়ে একজন শ্রমিক নেতার ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত ?

বাহারানে সুলতান বাহার: একজন শ্রমিকের চেয়ে দ্বিগুণ ভূমিকা পালন করতে হবে শ্রমিক নেতাকে। তার সততা, বুদ্ধিমত্তা থাকতে হবে। যদিও সেটা সম্ভব হচ্ছে না।

শ্রমিক বার্তা: রাষ্ট্রায়াত্ত কলকারাখানা দিন দিন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এর কারণ ও সমাধান কি হতে পারে ?

বাহারানে সুলতান বাহার: এটা মে দিবসের ডাকে হবে না। এখানে নেতৃত্বকে তুহুর ও সৎ থাকতে হবে।

শ্রমিক বার্তা: শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ে আপনার সংগঠনের ভূমিকা কি ?

বাহারানে সুলতান বাহার: আমরা কাজ করছি। সকলকে আহবান করছি। ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করছি। জেল:জুলুম সহ্য করেছি। আমরা আল্লাহর একজন বান্দা হিসেবে কাজ করি। সামর্থ অনুযায়ী আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

শ্রমিক বার্তা: আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

বাহারানে সুলতান বাহার: ধন্যবাদ আপনাকে।

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষ্যে দ্বি-মাসিক শ্রমিক বার্তার মুখোমুখি হয়েছেন -

মোঃ মাহতাব উদ্দিন শহিদ
সভাপতি
জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক জোট বাংলাদেশের

শ্রমিকবার্তা: আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসে আপনার মূল্যায়ন কি ? যে উদ্দেশ্যে শিকাগোতে শ্রমিকরা জীবন দিয়েছিলো তার কতটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে ?

মো. মাহতাব উদ্দিন শহিদ: শ্রমিকদের জীবন দেওয়ার উদ্দেশ্যে হাসিল হয়নি। শ্রমিক শ্রেণি এখনো মে দিবসটি সেভাবে বুঝে উঠতে পারেনি। তারা এখনো নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। আমরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি যেনো মে দিবসকে উপলক্ষ্য করে যেনো শ্রমিকরা তাদের অধিকার আদায়ে উদ্যোগী হয়।

শ্রমিক বার্তা: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক শ্রমদিবসের গুরুত্ব কতটুকু ?

মো. মাহতাব উদ্দিন শহিদ: বাংলাদেশে কাগজে কলমে মে দিবসের গুরুত্ব দেখানো হয় কিন্তু বাস্তবে শ্রমিকের কোন কাজে আসে না। মে দিবসের উদ্দেশ্যে এখনো আমরা বাস্তবায়ন করতে পারিনি।

শ্রমিক বার্তা: বাংলাদেশে শ্রমিকদের সংগঠনগুলোকে ঐক্যবদ্ধ দেখা যায় না। শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করতে আপনাদের সংগঠনের ভূমিকা কি ?

মো. মাহতাব উদ্দিন শহিদ: শ্রমিক সংগঠনগুলো ঐক্যবদ্ধ হতে চাইলেও মালিক পক্ষের কিছু এজেন্ডা তারা সব সময় শ্রমিক সংগঠনগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে প্রচেষ্টা চালায়। আমাদের সংগঠন থেকে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করতে আমরা নিরলস কাজ করে যাচ্ছি। নিজেদের এবং অন্যদের ঐক্যবদ্ধ করতে আমরা আলাপ আলোচনা ও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

শ্রমিক বার্তা: বাংলাদেশের শ্রমিক সংগঠনগুলো কি শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে সঠিক ভূমিকা রাখছে বলে ?

মো. মাহতাব উদ্দিন শহিদ: শ্রমিক সংগঠনগুলো সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারলে বহু আগেই মে দিবসের উদ্দেশ্যে বাস্তবায়ন হতো। কিন্তু মালিক পক্ষের কূট-কৌশলের কারণে তারা পেরে উঠে না। দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এখনো শ্রমিকদের কেউ নেই। তারা উপযুক্ত জায়গায় কথা বলতে পারে না। অন্যদিকে পার্লামেন্টে ৬০ থেকে ৬৫ ভাগ আছে, যারা ব্যবসায়ী ও মালিক পক্ষ এবং তারাই তাদের সুবিধা আদায় করে নেয়। শ্রমিকদের পক্ষে দু একজন থাকলেও তারা হা না ভোট বা অন্যভাবে সফল হয় না। ফলে সরকারের কাছে শ্রমিকদের কথা তেমন গ্রহণযোগ্য হয় না।

শ্রমিক বার্তা: এদেশের শ্রমিকের মজুরী ন্যায্য মনে করেন কি? একজন শ্রমিকের মজুরি কত হওয়া উচিৎ?

মো. মাহতাব উদ্দিন শহিদ: বর্তমান বাজারমূল্যের সাথে চলমান মজুরি সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এ মজুরি দিয়ে শ্রমিকের পরিবার চালানো সম্ভব না। আমাদের দেশে শ্রমিক সংখ্যা বেশি। তাই মালিকপক্ষ এ সুযোগটি গ্রহণ করে। এ জন্য প্রয়োজন জাতীয় ন্যূনতম মজুরি।

শ্রমিক বার্তা: বর্তমান যে শ্রম আইন ও শ্রম নীতি তা দ্বারা কি শ্রমিকের প্রকৃত কল্যান ও অধিকার আদায় কি সম্ভব ?

মো. মাহতাব উদ্দিন শহিদ: শুধু আইন আছে কিন্তু বাস্তবায়ন নেই। এ আইনগুলোও বাস্তবায়ন হলে শ্রমিকের কিছুটা কষ্ট লাঘব হতো। অন্যদিকে মালিকরা তাদের পক্ষের আইন ১০০ভাগ বাস্তবায়ন করে। আর সরকারও মালিকদের পক্ষে। এ আইন দ্বারা শ্রমিকের অধিকার আদায় সম্ভব না।

শ্রমিক বার্তা: শ্রমিকের অধিকার আদায় ও ন্যায্য পাওনা আদায়ে শ্রমিক সংগঠনগুলোর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন আছে কি না ?

মো. মাহতাব উদ্দিন শহিদ: অবশ্যই প্রয়োজন আছে। আমরা চেষ্টাও করছি। কিন্তু আমাদের পক্ষে সংসদে কথা বলার মত পর্যাপ্ত নেতৃত্ব নেই। ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য ইস্যুভিত্তিক ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আমরা সমন্বয় পরিষদ গঠন করেছি। একই ছাতার নিচে আসার জন্য সবাইকে আহ্বান করা হয়েছে। সবাইকে একই ছাতার নিচে আনা গেলে আশা করা যায় ভালো কিছু হবে শ্রমিকদের জন্য।

শ্রমিক বার্তা: শ্রমিকের অধিকার আদায়ে একজন শ্রমিক নেতার কেমন ভূমিকা হওয়া উচিৎ বলে আপনি মনে করেন ?

মো. মাহতাব উদ্দিন শহিদ: শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে শ্রমিক নেতাদের জোড়ালো ভূমিকা রাখা উচিত। সরকার ও মালিক তাদের জায়গাগুলোতে দরকষাকষি করতে পারলে উদ্দেশ্যে হাসিল সম্ভব। তবে তা ঐক্যবদ্ধ ভাবে করতে হবে।

শ্রমিক বার্তা: রাষ্ট্রায়াত্ত কলকারাখানা দিন দিন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এর কারণ ও সমাধান কি হতে পারে?

মো. মাহতাব উদ্দিন শহিদ: সরকার যাদের দায়িত্ব দেয় তারা যদি দুর্নীতিমুক্ত হয় তাহলে সেখানে সফলতা সম্ভব। আগে দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।

শ্রমিক বার্তা: শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ে আপনার সংগঠনের ভূমিকা কি?

মো. মাহতাব উদ্দিন শহিদ: আমরা সব সময় শ্রমিকদের পক্ষে দাবী দাওয়া নিয়ে কথা বলি। মালিকদের বেআইনি কাজগুলোর প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করার চেষ্টা করি। আমরা সব সময় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তাগিদ দিয়ে থাকি। আগামীতেও আমাদের জোড়ালো ভূমিকা অব্যাহত থাকবে। কিছু জায়গায় সফল হলেও ব্যর্থতাও আছে অনেক।

শ্রমিক বার্তা: আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

মো. মাহতাব উদ্দিন শহিদ: ধন্যবাদ আপনাকে।

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষ্যে দ্বি-মাসিক শ্রমিক বার্তার মুখোমুখি হয়েছেন -

রফিকুল ইসলাম সুজন
সভাপতি
বাংলাদেশ গার্মেন্টস এন্ড শিল্প শ্রমিক ফেডারেশন

শ্রমিক বার্তা: আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসে আপনার মূল্যায়ন কি? যে উদ্দেশ্যে শিকাগোতে শ্রমিকরা জীবন দিয়েছিলো তার কতটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে ?

রফিকুল ইসলাম সুজন: ১৮৮৬ সালে শিকাগোতে আন্দোলনরত শ্রমিকদের দাবি ছিলো ৮ ঘন্টা কাজ, ৮ ঘন্টা বিশ্রাম, ৮ ঘন্টা বিনোদন। কিন্তু বাংলাদেশে তার উল্টো চিত্র। ৮ ঘন্টার মজুরি শ্রমিকদের পরিবার চলছে না। ১২ ঘন্টাকাজ করেও জীবনযাপন কষ্ট হয়ে পড়েছে শ্রমিকদের। বাংলাদেশে মে দিবসের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন হয়নি। রাষ্ট্র ক্ষমতায় মালিকরা থাকলে সেখানে শ্রমিকরা বঞ্চিত হবে এটাই স্বাভাবিক।

শ্রমিক বার্তা: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক শ্রমদিবসের গুরুত্ব কতটুকু ?

রফিকুল ইসলাম সুজন: মে দিবস বাংলাদেশে ঘটা করে পালন করা হয় সত্যি। কিন্তু তাতে শ্রমিকের প্রকৃত কোন লাভ হচ্ছে না। শ্রমিকদের পক্ষে কথা বলতে গেলে উল্টো জুলুম নির্যাতন নেমে আসে। আমি নিজেও প্রায় ১০০ বেশি মামলার শিকার। বাংলাদেশের সবই মালিকদের পক্ষে। লেবার কোর্ট নিয়ে আমি সচিব, জজ, শ্রমমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দিয়েছি। শ্রমিকদের শেষ ভরসা হলো শ্রম আদালত। আইনে রয়েছে শ্রমিকদের মামলা ১৫০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে। কিন্তু ১২ বছরেও অনেক মামলা নিষ্পত্তি হচ্ছে না। করোনাকে পুঁজি করে শ্রম আদালতে জজ সাহেবরা দুই বছর তাদের কার্যক্রম বন্ধ রেখেছেন। আদালতেই যদি শ্রমিকরা ন্যায় বিচার না পায় তাহলে তারা যাবে কোথায় ?

শ্রমিক বার্তা: বাংলাদেশে শ্রমিকদের সংগঠনগুলোকে ঐক্যবদ্ধ দেখা যায় না। শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করতে আপনাদের সংগঠনের ভূমিকা কি ?

রফিকুল ইসলাম সুজন: বাংলাদেশে মালিকরা তাদের লোকজন দিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের সাথে লিয়াজু মেইনটেইন করে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে নেয়। শ্রমিক সংগঠনগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করতে আমরা সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা ২০১৩ সালে গার্মেন্টস শ্রমিক সমন্বয় পরিষদ গঠন করেছিলাম। সেখানে প্রায় ৫৬টি ফেডারেশন রয়েছে। এটার বর্তমান আহবায়ক হলো শাহজাহান খান। ওনার নেতৃত্বে আমরা আন্দোলন সংগ্রাম করে আসছি। আমরা চেষ্টা করছি।

শ্রমিক বার্তা: আপনি কি মনে করেন বাংলাদেশের শ্রমিক সংগঠনগুলো শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে সঠিক ভূমিকা রাখছে বলে?

রফিকুল ইসলাম সুজন: আসলে তারা সেভাবে ভূমিকা রাখতে পারছে না। কারণ মেয়র, মন্ত্রী, এমপি সবই মালিকপক্ষের। শ্রমিকদের পক্ষে কথা বলার কেউ নেই।

শ্রমিক বার্তা: আপনি কি মনে করেন এদেশের শ্রমিকের মজুরী ন্যায্য পায় ? একজন শ্রমিকের মজুরি কত হওয়া উচিত ?

রফিকুল ইসলাম সুজন: একজন শ্রমিকের পরিবার বলতে স্বামী, স্ত্রীসহ ৫ জন সদস্যের পরিবারে চলমান বাজার দরে বাঁচার মত মজুরি ৩০০০০ হাজার টাকা হওয়া উচিত। আমরা জাতীয় মজুরি ২০০০০ টাকা দাবি করে আসছি।

শ্রমিক বার্তা: বর্তমান যে শ্রম আইন ও শ্রম নীতি তা দ্বারা কি শ্রমিকের প্রকৃত কল্যান ও অধিকার আদায় কি সম্ভব ?

রফিকুল ইসলাম সুজন: বাংলাদেশের শ্রম আইন খুবই দুর্বল। বিনা নোটিশেই শ্রমিক ছাটাই করতে পারছে। মালিকরা জুট মাস্তান আর শিল্প পুলিশ ব্যবহার করে শ্রমিকদের পাওনা না দিয়েই যখন তখন বের করে দেয়। শ্রমিকরা অধিকার থেকে বরাবরই বঞ্চিত হয়ে আসছে। আইনের মারপেচে শ্রমিকদের আটকে রাখা হয়েছে।

শ্রমিক বার্তা: শ্রমিকের অধিকার আদায় ও ন্যায্য পাওনা আদায়ে শ্রমিক সংগঠনগুলোর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন আছে কি না ?

রফিকুল ইসলাম সুজন: বাংলাদেশের শ্রমিক সংগঠনগুলো বিভিন্ন দলের সাথে লিয়াজু মেইনটেইন করে চলে। ফলে শ্রমিকরা ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আমরা চেষ্টা করছি শ্রমিক সংগঠনগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য। লেবার কোর্টে যথাসময়ে বিচার পাওয়ার জন্য আমরা আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি।

শ্রমিক বার্তা: শ্রমিকের অধিকার আদায়ে একজন শ্রমিক নেতার কেমন ভূমিকা হওয়া উচিৎ বলে আপনি মনে করেন?

রফিকুল ইসলাম সুজন: শ্রমিকদের দাবী আদায়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি, শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন সংগ্রামের কোন বিকল্প নেই।

শ্রমিক বার্তা: রাষ্ট্রায়াত্ত কলকারাখানা দিন দিন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এর কারণ ও সমাধান কি হতে পারে ?

রফিকুল ইসলাম সুজন: সরকারের তদারকির অভাবে এগুলো বন্ধ হচ্ছে ও হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হচ্ছে। সরকার চাইলেই এগুলো অল্প সময়েই লাভজনক হতো।

শ্রমিক বার্তা: শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ে আপনার সংগঠনের ভূমিকা কি ?

রফিকুল ইসলাম সুজন: শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে আমাদের সংগঠন বরাবরই আন্দোলন সংগ্রাম করে আসছে। আমরা আগামীতে এ ধারা অব্যাহত থাকবে। মূল সমস্যা হলো ট্রেড ইউনিয়নগুলো খুবই দূর্বল। এগুলো সচল করতে আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করে যাচ্ছি।

ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের দায়িত্ব ও কর্তব্য

অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান

ঐক্যই শক্তি বা সংগঠিত মানুষই শক্তিশালী মানুষ। শ্রমজীবী মানুষ তুলনামূলকভাবে অসহায়। সেজন্য তারা যত যৌক্তিক কথাই বলুক, যতই আইনের কথা বলুক সংগঠিত শক্তির প্রমাণ দিতে না পারলে, সবাই মিলে সোচ্চার কণ্ঠে গর্জে উঠতে না পারলে, তাদের কথায় কেউই কর্ণপাত করবে না। এককভাবে একজন শ্রমিক দুর্বল হলেও তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারলে বড় শক্তিতে পরিণত হয়। সেই শক্তির সাহায্যে তারা একদিকে নিজেদেরকে জুলুম থেকে রক্ষা করতে পারে, অন্যদেরকেও জুলুমের হাত থেকে উদ্ধার করতে পারে। শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আইনস্বীকৃত প্লাটফর্ম হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন। আর শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমেই কেবল শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

ট্রেড ইউনিয়নের পরিচয়:

ট্রেড অর্থ ব্যবসা, চাকুরী, পেশা। ইউনিয়ন অর্থ সমিতি, সংঘ, একতা প্রভৃতি। পরিভাষায় ট্রেড ইউনিয়নকে নিম্নরুপ সংজ্ঞায়িত করা যায়।

➢কোন নির্দিষ্ট শ্রম পেশার শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থ রক্ষায় গঠিত নিবন্ধিত সংগঠন হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন।

➢একই চাকরীর বা পেশার জনগোষ্ঠীদের তাদের অধিকার রক্ষায় একতাবদ্ধ হওয়া।

➢শ্রমিক-মালিক, শ্রমিক–শ্রমিক, মালিক-মালিক এর সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সংগঠন গঠিত হয়, তা হল ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন।

➢ট্রেড ইউনিয়ন মূলত শ্রমিকদের দ্বারা গঠিত একটি আইনস্বীকৃত সংগঠন, যা শ্রমিকদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষায়, জীবনমান উন্নয়ন, জীবন ও জীবিকার নিশ্চয়তা বিধানে সবিশেষ ভূমিকা পালন করে।

শ্রম আইন অনুযায়ী ট্রেড ইউনিয়ন ৪ ধরনের হয়ে থাকে।

১. বেসিক ইউনিয়ন
২. পেশা ভিত্তিক ফেডারেশন বা ক্রাফট ফেডারেশন
৩. জাতীয় ফেডারেশন ও
৪. কনফেডারেশন

ট্রেড ইউনিয়নের সবচেয়ে প্রাথমিক স্তর হচ্ছে বেসিক ইউনিয়ন। যা এককভাবে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কিংবা কোন প্রতিষ্ঠানপুঞ্জে গঠন করা যায়। আর একই পেশার পাঁচ বা ততোধিক বেসিক ইউনিয়নের সমন্বয়ে ক্রাফট বা পেশা ভিত্তিক ফেডারেশন গঠিত হয়। একাধিক পেশার ২০ বা ততোধিক বেসিক ইউনিয়নের সমন্বয়ে গঠিত হয় জাতীয় ফেডারেশন। ১০ টি জাতীয় ফেডারেশনের সমন্বয়ে গঠিত হয় কনফেডারেশন।

ট্রেড ইউনিয়নের উদ্দেশ্য: ট্রেড ইউনিয়নের উদ্দেশ্যকে ২ ভাগে ভাগ করা যায় ১. সাধারণ উদ্দেশ্য ২. আদর্শিক উদ্দেশ্য

ট্রেড ইউনিয়নের সাধারণ উদ্দেশ্য:

ট্রেড ইউনিয়নের সাধারণ উদ্দেশ্য বলতে প্রধানত: সে উদ্দেশ্যকে বুঝায় যে উদ্দেশ্যে শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়নের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। তা নিম্নরূপ

শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা:

কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র আদায়, কর্মঘণ্টা নির্ধারণ, কাজের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি, বেতন, বোনাস, ইনক্রিমেন্ট ও ভবিষ্যত তহবিল গঠনে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন আইনস্বীকৃতভাবে ভূমিকা পালন করার অধিকারী হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ মালিক কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা বা দর কষাকষির মাধ্যমে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সুবিধা ও চাকরীর নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করণে ভূমিকা পালন করে থাকেন। এছাড়া সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে শ্রম আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা,দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা, শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্য রক্ষায় ট্রেড ইউনিয়ন ভূমিকা পালন করে থাকে।

শ্রমিকদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি:

কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক বা সংশ্লিষ্ট পেশার শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন, অভাব পূরণ করা, আর্থিক অস্বচ্ছলতা দূর করা, সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, মানসম্মত মজুরী নিশ্চিত করা, নৈতিক উন্নতি সাধন, অসামাজিক কর্মকান্ড থেকে বিরত রাখা, শ্রমিকদের সন্তানদের লেখা-

পড়া, বিয়ে শাদী দেওয়া ও শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় কল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা ট্রেড ইউনিয়নের অন্যতম উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। বাস্তবিক পক্ষে শ্রমিকের মজুরী, ছুটি, বোনাস, গ্র্যাচুয়িটি, পেনশন, ক্ষতিপূরণ, ওভারটাইম, বকেয়াসহ চুক্তিভিত্তিক ও আইনসঙ্গত সকল প্রাপ্য আদায়, শ্রমিকদের জন্য শোভন কাজ ও কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ শ্রমিককে সাংগঠনিক ও আইনি সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন একটি অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে।

ট্রেড ইউনিয়নের আদর্শিক উদ্দেশ্য:

শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস পাঠে আমরা জানতে পারি কাল মার্কস-লেলিন সমাজতান্ত্রিক আদর্শ বিশ্বব্যাপী কায়েমের লক্ষ্যে শ্রমিক শ্রেণির উপর ভর করেছিলেন। তারা শ্রমিক আন্দোলনকে শ্রমিক শ্রেণির অধিকার আদায়ের আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করলেও প্রকৃতপক্ষে শ্রমিক মেহনতী শ্রেণীকে সমাজতন্ত্রের আদর্শে গড়ে তোলার মাধ্যম হিসেবে 'ট্রেড ইউনিয়ন' আন্দোলনকে ব্যবহার করে। এ লক্ষ্যে তারা ট্রেড ইউনিয়নের অর্থ করেছে- Trade union means school of communism.

শোষকদের হাত থেকে শাসন ও সম্পদ কেড়ে নিয়ে শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হবে ভেবে সমাজতন্ত্রের প্রতি প্রচুর মানুষ উৎসাহী হয়ে উঠে। এ সুযোগে বিগত শতাব্দীতে রাশিয়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন, কিউবা, লাওস, ভেনিজুয়েলা, উত্তর কোরিয়া, আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, আফগানিস্তান, মায়ানমার, গাম্বিয়াসহ পৃথিবীর ৩০ টিরও বেশী দেশে কমিউনিস্ট বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে। যার মূল চালিকাশক্তি ছিলো শ্রমজীবী মানুষ।

আজ থেকে ১৫০০ বছর আগে আরবে রাসূল (সা.) এর ইসলামী বিপ্লবে সে সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষ যেমন- রাখাল, গোলাম ও কৃতদাসের ভূমিকা অন্যদের চেয়ে ঈর্ষণীয় ছিল। শত যুলুম নির্যাতন ও প্রলোভন তাদের রাসূল (সা.) এর বিপ্লবী আন্দোলন থেকে পিছু হঠাতে পারেনি। অধুনা আমাদের আর্থসামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিচার করলে শ্রমিকরা কৃতদাস শ্রেণির পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং কোন আদর্শকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে শ্রমিক জনগোষ্ঠীকে সে আদর্শ বাস্তবায়নের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করতে পারলে সে আদর্শকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করা অনেকটা সহজ হয়ে যায়। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন একটি আদর্শিক সংগঠন হিসেবে ট্রেড ইউনিয়নের ময়দানে সাধারণ উদ্দেশ্য ছাড়াও কতিপয় আদর্শিক উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে থাকে । যা নিম্নরূপ

১. কল্যাণমূলক ও ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে শ্রমিক ময়দানকে প্রস্তুত করা। এই লক্ষ্যে শ্রমজীবী মানুষকে পরিকল্পিত উপায়ে দাওয়াতের বলয়ে নিয়ে এসে ইসলামী জীবন বিধান পুরোপুরি পালনে অভ্যস্ত করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালানো।

২. ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রমিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান করে শ্রমজীবী মানুষের সত্যিকার মুক্তি সাধন করা।

৩. ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শ্রমজীবী মানুষকে সম্পৃক্ত করা এবং এ বিষয়ে জনমত গঠনে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম জোরদার করা।

৪. শ্রমিক ময়দানে ইসলামী আদর্শের প্রভাব সৃষ্টি করা এবং শ্রমিকদেরকে ইসলামী আদর্শের প্রভাব বলয়ে নিয়ে আসা। এ লক্ষ্যে ট্রেড ইউনিয়নসমূহকে ইসলাম ও ইসলামী মূল্যবোধ শেখার পাঠশালা হিসেবে পরিণত করা।

৫. প্রচলিত ট্রেড ইউনিয়নের ধারায় পরিবর্তন সাধন করে নতুন ধারার সূচনা করা।

৬. শ্রমিক ময়দানে সৎ নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা।

৭. মজলুম মানুষের অধিকার রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালন করা এবং সকল প্রকার জুলুমের অবসান ঘটিয়ে সুবিচার নিশ্চিত করা। "লা তাজলিমুনা ওলা তুজলামুন" এ বানীকে সর্ব পর্যায়ে চালু করা।

৮. শ্রমিকদের বৈধ ও ন্যায়সংগত অধিকার আদায়ে অগ্রনী ভূমিকা পালন করা।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের এফিলিয়েটেড ট্রেড ইউনিয়নসমূহকে সঠিকভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দকে নিম্নোক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে সম্পাদন করা প্রয়োজন–

প্রয়োজনীয় জ্ঞানগত দক্ষতা অর্জন করা ঃ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেক নেতৃবৃন্দের বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ ও বিধিমালা সম্পর্কে সম্যক অবগত থাকা জরুরী। বিশেষ করে শ্রম আইনের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১৭৫- ২০৮ পর্যন্ত ৩৪ টি ধারা সকলের জানা আবশ্যক। কেননা এ ধারাসমূহে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন,ইহার সদস্য হওয়া, রেজিস্ট্রেশনের আবেদন, রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তি,ইউনিয়ন পরিচালনা, মালিকশ্রমিকের অসৎ শ্রম আচরণ, অংশগ্রহণ কমিটি ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত বলা হয়েছে। এছাড়া আদর্শিক শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে আদর্শের বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞানগত দক্ষতা অর্জন করতে হবে। সাধারণ শ্রমজীবী মানুষদের ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করতে নেতৃবৃন্দকে ইসলামী শ্রমনীতির সুফল সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে।

শ্রম আইনের নির্দেশনা মোতাবেক ট্রেড ইউনিয়নকে পরিচালনা করা:

প্রত্যেক ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনকে বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ও শ্রম বিধিমালা অনুসরণ করে ইউনিয়নের কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। আইনের নির্দেশনা মোতাবেক কার্যক্রম পরিচালিত না হলে এক সময় শ্রম অধিদপ্তর থেকে ইউনিয়নের নিবন্ধন বাতিল করে দেওয়া হয়। আইনের নির্দেশনা আলোকে ইউনিয়ন সমূহকে পরিচালনার লক্ষ্যে ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দকে নিম্নাক্ত নির্দেশনা সমূহ অনুসরণ করে ইউনিয়নের কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

১. ইউনিয়নের কার্যক্রম প্রকাশ্যে পরিচালনা করা। সাইনবোর্ডসহ অফিস থাকা।

২. ইউনিয়নের নামে সাধারণ সদস্যদের আইডি কার্ড প্রদান করা।

৩. ইউনিয়নের নামে চাঁদা আদায়ের রশিদ ছাপানো এবং গঠনতন্ত্র মোতাবেক ইউনিয়নের সদস্যদের থেকে নিয়মিত মাসিক চাঁদা আদায় করা।

৪. প্রতিমাসে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব সঠিক নিয়মে সংরক্ষণ করা।

৫. প্রতি বছরের ৩০ এপ্রিলের মধ্যে ইউনিয়নের বার্ষিক রিটার্ন সংশ্লিষ্ট শ্রম অধিদপ্তরে দাখিল করা।

৬. শ্রম আইনের নির্দেশনা মোতাবেক কমিটির মেয়াদ শেষ হলে নির্ধারিত সময়ে ইউনিয়নের নির্বাচন সম্পন্ন করে নতুন কমিটি গঠন করা। (ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে ট্রেড ইউনিয়নের নির্বাচন ফেডারেশনের সংশ্লিষ্ট অঞ্চল এবং স্থানীয়

শাখার নির্দেশনা মোতাবেক সম্পন্ন করতে হবে।)

৭. প্রতি ৩ মাসে ১ বার ট্রেড ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির সভা এবং বছরে কমপক্ষে ১ বার সাধারণ সদস্যদের নিয়ে সভা করা।

৮. ইউনিয়নের সকল কাগজপত্র যত্নসহকারে সংরক্ষণ করা। যথা- ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির প্রত্যয়নপত্র, গঠনতন্ত্র, সদস্য তালিকা, ফেডারেশনের সাথে অর্ন্তভুক্তির দলিল, কার্যবিবরনী খাতা, রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত কাগজপত্র প্রভৃতি।

৯. ইউনিয়নের সদস্য বৃদ্ধি ও ঘাটতি তালিকা সঠিক নিয়মে সংরক্ষণ করা।

ইউনিয়নভুক্ত সদস্যদের অধিকার আদায়ে ভূমিকা পালন করা:

১. সংশ্লিষ্ট পেশার শ্রমিকদের সমস্যা চিহ্নিত করা এবং সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখা।

২. শ্রমিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিয়মতান্ত্রিক ও ধারাবাহিক আন্দোলন পরিচালনা করা।

৩. ন্যায্য দাবী-দাওয়া আদায়ে ইউনিয়নের ব্যানারে শান্তিপূর্ণ মিছিল, সমাবেশ, যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট স্মারকলিপি পেশ ও মানববন্ধনের আয়োজন করা।

৪. শ্রমিকদের বিপদে-আপদে পাশে থাকা। নির্যাতন ও নিপীড়ন থেকে রক্ষায় ভূমিকা রাখা এবং আইনী সহযোগিতা প্রদানে কার্যকর ভূমিকা পালন করা।

৫. অধিকার সম্পর্কে নিজেরা সচেতন থাকা এবং শ্রমিকদেরকে সচেতন করা।

৬. কমপক্ষে প্রতিদিন আসর কিংবা মাগরিবের পর থেকে এশার নামাজ পর্যন্ত ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দকে ইউনিয়ন অফিসে থাকা প্রয়োজন। ইউনিয়নের সদস্যদেরকে এ সময়ে অফিসে আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। এ সময়ে নেতৃবৃন্দ শ্রমিকদের সুবিধা-অসুবিধার খবর জানার চেষ্টা করবেন। বিশেষ কোন সমস্যা তৈরি হলে তা সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

ইউনিয়নের কার্যক্রম সম্প্রসারণে ভূমিকা পালন করা ঃ

১. সাধারণ শ্রমিকদের নিকট ইউনিয়নকে পরিচিত করা এবং নিজেরা পরিচিত হওয়া।

২. তৃনমূল পর্যায়ে ইউনিয়নের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা। যে প্রশাসনিক উপজেলা/থানা কিংবা অঞ্চল নিয়ে ইউনিয়নটি গঠিত হয়েছে সংশ্লিষ্ট উপজেলার প্রত্যেকটি ইউনিয়নে, থানার প্রত্যেকটি প্রশাসনিক ওয়ার্ডে ইউনিয়নের সাধারণ সদস্যদের দিয়ে কমিটি গঠন করা।

৩. সংশ্লিষ্ট পেশার প্রভাবশালী ও নেতৃত্বের গুনাবলী সম্পন্ন শ্রমিকদেরকে ইউনিয়নের সাথে সম্পৃক্ত করা।

৪. সাধারণ শ্রমিকদের মাঝে পরিকল্পিতভাবে সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৫. স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, ভাষা দিবস, আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস সহ গুরুত্বপূর্ণ দিবসগুলোতে ইউনিয়নের উদ্যোগে আলোচনা সভা, র‌্যালি, শিক্ষা সফর, সামষ্টিক ভোজ, খেলাধুলাসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক কর্মসূচি পালন করা।

৬. সাধারণ শ্রমিকদের মাঝে পরিকল্পিত দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৭. ডি-ফরম পূরণ করে নিয়মিত ইউনিয়নের সদস্য বৃদ্ধি করা।

ইউনিয়নের সাংগঠনিক মজবুতি অর্জনে ভূমিকা পালন:

১. ইউনিয়নের সাংগঠনিক মান বজায় রাখা। অর্থ্যাৎ ট্রেড ইউনিয়নটি সাংগঠনিক যে মানের (ইউনিট/ওয়ার্ড/থানা) হবে সে অনুযায়ী সাংগঠনিক তৎপরতা পরিচালনা করা।

২. ফেডারেশনের নির্দেশনা অনুযায়ী বার্ষিক ও মাসিক পরিকল্পনার আলোকে ইউনিয়নের সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৩. ফেডারেশন থেকে প্রকাশিত " ট্রেড ইউনিয়ন কার্যবিবরনী খাতা" নিয়মিত ব্যবহার করা।

৪. নিয়মিত মাসিক রিপোর্ট তৈরি করা ও ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে পর্যালোচনা করা।

৫. মাসিক রিপোর্ট ফেডারেশনের সংশ্লিষ্ট উপজেলা/জেলায় জমা দেওয়া এবং সংশ্লিষ্ট সেক্টরের উর্ধ্বতন দায়িত্বশীলদের নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা।

৬. সাংগঠনিক মৌলিক প্রোগ্রাম ও নৈতিক প্রশিক্ষণ মূলক কার্যক্রম নিয়মিত বাস্তবায়ন করা।

৭. ইউনিয়নের সদস্যদের মধ্য থেকে টার্গেট নিয়ে ফেডারেশনের জনশক্তি (সদস্য,কর্মী) ও সাধারণ সদস্য বৃদ্ধি করা।

৮. শ্রমিক সেবামূলক কাজের মাধ্যমে শ্রমিকদের মাঝে ইউনিয়নের প্রভাব বৃদ্ধি করা।

৯. ব্যাপক শ্রমিকবান্ধব ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

নেতৃত্বের চারিত্রিক প্রভাব সৃষ্টি করা:

- ❖ নিজেদের আমল ও মুয়ামেলাতী জিন্দেগী সুন্দর করা।
- ❖ পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখা।
- ❖ লেনদেনে স্বচ্ছতা বজায় রাখা।

ইউনিয়নের সদস্যদের নৈতিক ও আত্মিক মানউন্নয়নে ভূমিকা রাখা:

ইউনিয়নের সদস্যদের সহীহ কোরআন তেলাওয়াত শিখানো, শুদ্ধভাবে নামাজ পড়ার নিয়ম ও প্রয়োজনীয় মাসয়ালা মাসায়েল শিখানোর উদ্যোগ নেওয়া। সর্বোপরি ইউনিয়নের উদ্যোগে সদস্যদেরকে পূর্ণাঙ্গ মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালানো।

নেতৃত্ব তৈরিতে ভূমিকা পালন করা:

১. ট্রেড ইউনিয়নের কাজে দক্ষতা তৈরিতে ইউনিয়নের সদস্যদের দাবীনামা পেশ,দর কষাকষি,কারণ দর্শাও নোটিশের জবাবদানসহ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

২. শ্রমআইন, শ্রম বিষয়ক জ্ঞান ও ইসলামী শ্রমনীতি বিষয়ক সম্যক ধারণা প্রদান করা।

৩. বাছাইকৃত জনশক্তিকে সংশ্লিষ্ট পেশার সমস্যা ও সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যত করণীয় বিষয়ে ধারণা প্রদান করা।

৪. ইউনিয়নে বিকল্প যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টির বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৫. অগ্রসর জনশক্তিকে বাছাই করে মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৬. ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও সাহচার্য্য প্রদান করা।

৭. জ্ঞানের ঘাটতি দূর করা।

৮. নৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিশুদ্ধতা অর্জনে ভূমিকা রাখা।

৯. আমল আখলাক ও আধ্যাত্মিক মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যক্তিগতভাবে নফল ইবাদতের অভ্যাস গড়ে তোলা।

আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখা:

✓ইউনিয়নভুক্ত সকল সদস্যদের মাসিক নির্ধারিত চাঁদা নিয়মিত আদায় করা।

✓শুভাকাঙ্খী বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া

✓উপদেষ্টা সংগঠন থেকে সহযোগিতা নেওয়ার প্রচেষ্টা চালানো।

নেতৃবৃন্দের কতিপয় বিশেষ দায়িত্ব:

১. ইউনিয়নের কার্যক্রম পরিচালনায় গতিশীল ও স্বচালিত হতে হবে।

২. ইউনিয়নের কার্যক্রমে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা।

৩. মতানৈক্য, মতবিরোধ, মতপার্থক্য ও চিন্তার বিভাজন পরিহার করে এক ও অভিন্ন চিন্তার আলোকে ইউনিয়নের কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৪. সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা অর্জন করা।

৫. যৌথ দর কষাকষি ও শ্রমিকদের সংগঠিত করার যোগ্যতা অর্জন করা।

৬. সকল ক্ষেত্রে সাহসী ভূমিকা পালন করা।

৭. পারস্পরিক পরামর্শ ও আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

৮. ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ সদস্যদের মাঝে আন্তরিক এবং ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা। কাউকে প্রতিপক্ষ না ভাবা এবং অপরের প্রতি প্রতিহিংসামূলক মনোভাব পোষণ না করা।

৯. অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন নেত্ববৃন্দের সাথে দাওয়াতী মানসিকতা নিয়ে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা ও সম্পর্ক বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহন করা।

১০. ইউনিয়নকে আন্দোলনের সত্যিকার মেজাজ ও পরিবেশের আলোকে গড়ে তোলা।

১১. সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানার নির্বাহী কর্মকর্তা (TNO/UNO), থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (OC) ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

১২. ফেডারেশনের দৃষ্টিভঙ্গি ও নির্দেশনার আলোকে ইউনিয়নের সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

১৩. প্রতিটি ইউনিয়নকে শ্রমিক সেবা ও শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালনের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের এক একটি বাতিঘর হিসেবে তৈরি করার উদ্যোগ নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করা। মহান রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে উপরিউক্ত নির্দেশনার আলোকে ট্রেড ইউনিয়ন সমূহকে পরিচালনা করার তাওফিক দান করুন। আমীন

লেখক: সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

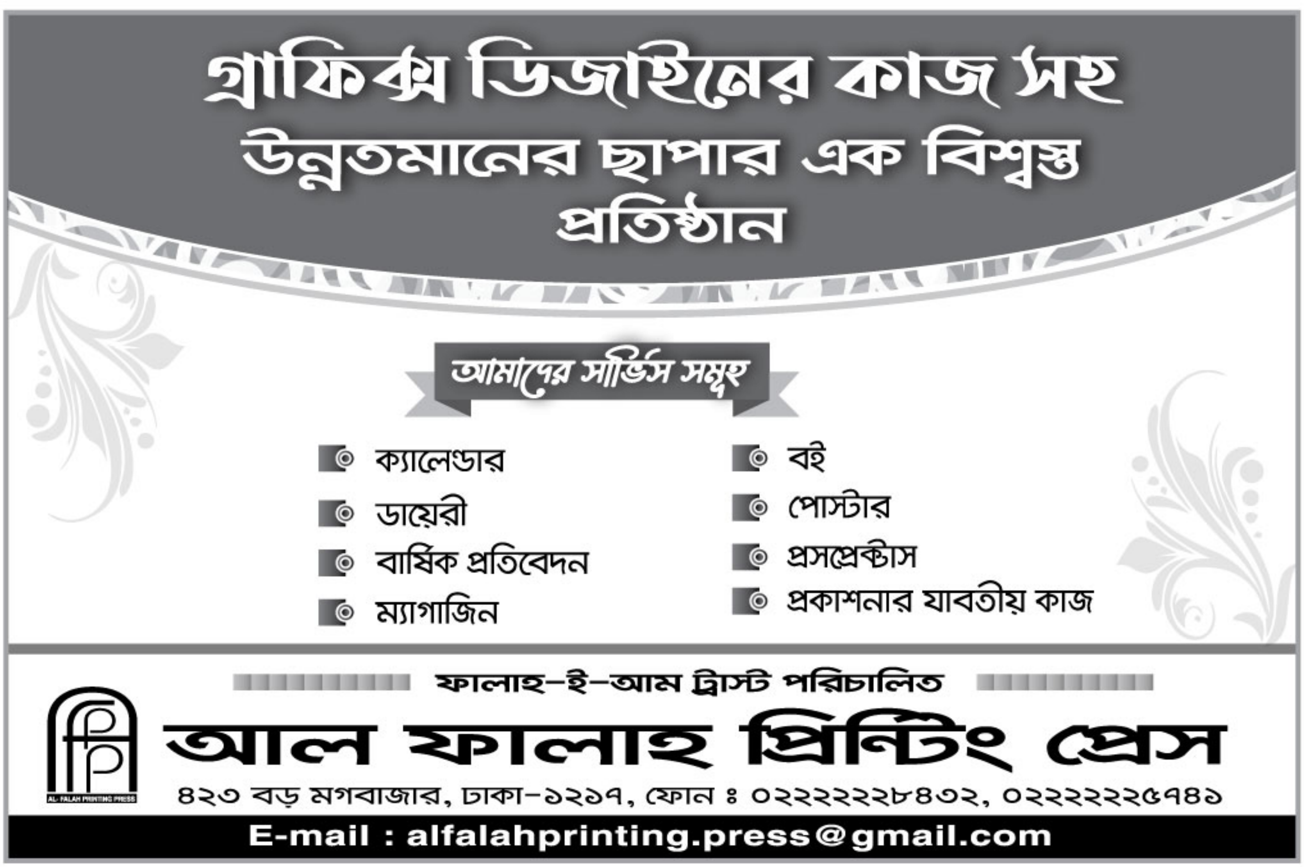

নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি বিড়ম্বনা ও তার প্রতিকার

অ্যাডভোকেট সাবিকুন্নাহার মুন্নী

গত সংখ্যার পর....

❖ **আইনের সুবিধা বঞ্চিত নারী শ্রমিকের বাস্তব অবস্থা:**

▪ কেস স্টাডি-১

রোকসানা (২০)। বিয়ে হয়েছে দুই বছর হলো। সম্প্রতি এক সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। ১৬ বছর বয়স থেকেই কাজ করতেন গার্মেন্টসে। ২০১৭ সালে গর্ভধারণের তিনমাস পরেই চাকরি ছেড়ে দেন তিনি। আট মাস কাজ ছাড়া থেকে দুই মাসের সন্তান রেখে আবারও কাজে যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন। মাতৃত্বকালীন চার মাসের ছুটি ও পাওনাদি না নিয়ে তাহলে কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন কেন প্রশ্নে তিনি বলেন, কাজ ছেড়ে দিতে গর্ভবতী শ্রমিক বাধ্য হয়। তাকে যে সিঁড়ি দিয়ে কাজে উঠতে হয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা হয়তো দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, এই জায়গাগুলোতে কেউ ছাড় দিবে না। ফলে এমন অবস্থা তৈরি করে রাখা হয়েছে যাতে এ সময়টায় শ্রমিক কাজ ছেড়ে দেয়। আর মালিক বলছেন, শ্রমিকের মাতৃত্বকালীন ছুটি আমরা দিতে চাই, তারা নিতে আসে না। কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যায়।

অথচ আমরা জানি বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ - এর ৪৫ ধারা অনুযায়ী, অন্তঃসত্ত্বা শ্রমিক, সন্তান প্রসবের আগে ৮ সপ্তাহ এবং প্রসবের পরের ৮ সপ্তাহ, মোট ১৬ সপ্তাহ পূর্ণ মজুরিতে ছুটি পাওয়ার অধিকার রাখেন। মালিক এই ছুটি দিতে বাধ্য। চাকরিতে এ ছুটি ভোগ করা যাবে সর্বোচ্চ দুইবার এবং একটি নির্দিষ্ট হারে তার নিয়োগকর্তার কাছ থেকে আর্থিক ভাতা পাবেন। তবে মাতৃত্বকালীন এসব সুবিধা পেতে একজন নারী শ্রমিককে সেই নিয়োগকর্তার অধীনে সন্তান প্রসবের আগে কমপক্ষে ছয় মাস চাকরি করতে হবে।

দেশে নারীর কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড়ো খাত তৈরি পোশাকশিল্প। আইন অনুযায়ী, কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত গর্ভবতী মায়েদের চার মাস ছুটি পাওয়ার কথা। অভিযোগ আছে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গর্ভবতী মায়েরা এ ছুটি পাচ্ছেন না। সরেজমিনে দেখা গেল পরিস্থিতি ভিন্ন। ছুটি কেউ নিতে যায় না, কেননা শ্রমিকদের অভিযোগ মালিকপক্ষ ছুটি দিতে চায় না। শ্রমআইনে বেতনসহ চার মাসের ছুটি পাওয়ার কথা থাকলেও গার্মেন্টস মালিকরা তা মানছেন না। তাই, গর্ভধারণের কয়েক মাসের মধ্যে কাজ ছেড়ে দিয়ে যাওয়া শ্রমিক কোনোমতে সন্তান জন্ম দিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই নতুন করে কাজে যোগ দিতে বের হন। রাজধানীর বিভিন্ন গার্মেন্টসে কর্মরত মা হওয়া নারী শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে মালিকদের শ্রম আইন অমান্য এবং তাদের অমানবিক আচরণের কথা জানা যায়।

▪ কেস স্টাডি-২

মিরপুর নিবাসী গার্মেন্টস শ্রমিক আকলিমা ৭ মাসের গর্ভকালীন সময়ে চাকরি ছেড়ে বাসায় আছেন। চার মাসের বেনিফিটসহ ছুটি নিয়ে তার কাজ হতো কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, গর্ভের এ পর্যায়ে এসে আসলে গার্মেন্সের যে কাজের চাপ সেটা নেওয়া সম্ভব না। আর যারা কাজ করায় তাদের আচরণও খুব খারাপ থাকে। সে কারণে সন্তানের কোনো ক্ষতি না করতে চাইলে কাজ ছাড়ার কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু কাজ আমরা কেউই স্বেচ্ছায় ছাড়ি না।

মালিকরা মাতৃত্বকালীন ছুটি নিয়ে মিথ্যাচার করে উল্লেখ করে গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক জলি তালুকদার বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মালিকরা চার মাসের ছুটি বেনিফিটসহ দিতে চায় না। বরং নানাভাবে শ্রমিকদের হয়রানি করা হয়। এসব এড়াতে কখনও কখনও শ্রমিকরা বাধ্য হয় চাকরি ছেড়ে দিতে। সেটাকে কি স্বেচ্ছায় চাকরি ছেড়ে দেওয়া বলা যাবে? তিনি বলেন, যেসব নারী শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত নয় তারা এগিয়ে না এলেও, বেনিফিট পায়নি এরকম অনেক শ্রমিক মামলা করে তাদের দাবি আদায় করেছে এমন উদাহরণও আছে। মাতৃত্বকালীন ছুটির উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, বাচ্চা প্রসবের দুই মাস আগে এবং পরের দুই মাস মিলিয়ে চার মাসের ছুটি পাওয়ার কথা শ্রমিকের। যেসব মালিক ছুটি দেন বলে দাবি করেন তারা এই পুরো সময়টা ছুটি দেন এমন উদাহরণ নেই বললেই চলে। কেউ কম ছুটি দেন কেউ টাকা দিতে চান না। একটা কারখানায় কেউ কোনোদিন মাতৃত্বকালীন ছুটি চাইতে যায়নি এই কথা দিয়েই বোঝা যায় এটা কতটা মিথ্যাচার!

❖ **মাতৃত্বকালীন ছুটি বিড়ম্বনা ও তার প্রতিকারঃ**

মাতৃত্বকালীন এ সুবিধা সরকারি পর্যায়ে চাকুরীরত নারীরা যতটুকু পাচ্ছে বেসরকারি খাতে কর্মজীবী মায়েরা তা পাচ্ছেন না, তাঁদের মাতৃত্বকালীন ছুটি মালিক বা কর্তাব্যক্তিদের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। ছুটি নিয়ে অনেক কর্মজীবী মাকে নানা সমস্যায় পড়তে হয়। অনেকেই বলেন "বাস্তবে এর অস্তিত্ব নেইঃ কেবল ছুটি আছে কাগজে" অর্থাৎ "কাজীর গরু কিতাবে আছে" এ অবস্থা!

▪ মাতৃত্বকালীন ছুটির ক্ষেত্রে আইনের যতটুকু সুবিধা দেওয়া আছে তা ঠিকভাবে প্রয়োগ করার জন্য একটা আলাদা সেল বা অভিযোগের জায়গা থাকার প্রয়োজন এবং সেটিকে নিয়মিত তত্ত্বাবধান প্রয়োজন যেন আইনের সুবিধাটা অন্তত নিশ্চিত করা সম্ভব হয় ।

▪ অনেক ক্ষেত্রে মাতৃত্বকালীন সমস্যার জন্য কাজের ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণের হারও কম। গবেষণা থেকে এমন প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ আনুপাতিক হারে অনেক নিম্ন। এই নিম্ন হারের জন্য অনেকগুলো সমস্যার মাঝে অন্যতম একটি সমস্যা হচ্ছে মাতৃত্বের দায়িত্বের সঙ্গে কর্মক্ষেত্রের সমন্বয় করতে না পারা।

বর্তমানে বিডিওএসএন তাদের "মিসিং ডটার" নামক প্রকল্পের মাধ্যমে নারীদের কর্মক্ষেত্রে সংযুক্ত করতে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। আমাদের দেশে নারীদের কাজে নিতে হলে তাদের অবস্থান অনুযায়ী আবাসন সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে। তা-না হলে অনেক নারী আবাসন সমস্যার কারণে কর্মক্ষেত্রে নানা বিপত্তির সম্মুখীন হয়ে থাকে।

▪ অন্যদিকে মাতৃত্বকালীন এ ছুটি নিয়ে সরকারি ও বেসরকারি খাতে কর্মরত মায়েদের মধ্যে যে বৈষম্য তৈরি হয়েছে তা দূর করার চেষ্টা করা। সরকারি খাতে কর্মজীবী মায়েরা মাতৃত্বকালীন ছুটি পাচ্ছেন ছয় মাস। বেসরকারি খাতে কর্মজীবী মায়েরা তা পাচ্ছেন না, তাঁদের মাতৃত্বকালীন ছুটি প্রতিষ্ঠানের মালিক বা কর্তব্যক্তিদের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে।

▪ দেশে নারীর কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় খাত তৈরি পোশাকশিল্প। আইন অনুযায়ী কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মায়েদের চার মাস ছুটি পাওয়ার কথা। অভিযোগ আছে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মায়েরা এ ছুটিও পাচ্ছেন না। ছুটি বঞ্চিত এসব নারীরা মনে করেন-সরকারি কর্মজীবী নারী ও বেসরকারি কর্মজীবী নারী একই প্রক্রিয়ায় মা হচ্ছেন। সরকারি কর্মজীবী মায়েদের জন্য সরকার প্রজ্ঞাপন জারি করে ছয় মাস ছুটি নিশ্চিত করল। আমরা কী দোষ করলাম? ছয় মাসের মাতৃত্বকালীন সুবিধা যারা পান তারা নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করেন। কারণ নবজাতকের লালনপালনের জন্য তিন বা চার মাস খুবই কম সময়। প্রকৃত অর্থে সরকারি বা বেসরকারি মা বলে আলাদা কিছু নেই। সব মাকে একই ধরনের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। মা ও সন্তানের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্যই মাতৃত্বকালীন ছুটি জরুরি। সরকার ইচ্ছে করলেই রাষ্ট্রের স্বার্থেই সব মায়ের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাস করে দিতে পারে। এ ব্যাপারে ট্রেড ইউনিয়নগুলোও নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় জোর দাবী পেশ করতে পারে।

▪ জাতিসংঘের নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ বা সিডও সনদে মাতৃত্বকালীন ছুটিকে নারীর অধিকার বলা হয়েছে। সনদে মাতৃত্ব, সন্তান লালন-পালন পরিবার ও রাষ্ট্রের দায়িত্বের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই অধিকার দেশের অনেক মা ভোগ করতে পারছেন না।

▪ প্রসূতি বিশেষজ্ঞদের মতে, মাতৃত্বকালীন ছুটি নারীর স্বাস্থ্যের ও শিশু পুষ্টির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ছুটি নিয়ে অনেক কর্মজীবী মাকে নানা সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। দেশের একটি বড় এনজিওতে কর্মরত এক নারী বলেন, কম সময়ের ব্যবধানে দুই সন্তান হওয়াতে প্রতিষ্ঠান ছয় মাস করে ছুটি দিয়েছে। তবে পরপর মাতৃত্বকালীন ছুটি কাটানোর অপরাধে অফিস বার্ষিক মূল্যায়নে আমাকে অনেক কম নম্বর দিয়েছে।'

একটি বেসরকারি টেলিভিশনে কর্মরত একজন কর্মজীবী নারী বলেন, 'আমার প্রতিষ্ঠানে মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাস দিচ্ছে না। সন্তান হওয়ার আগেই চিকিৎসকের পরামর্শে আমাকে বেশ কয়েক দিন সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হয়। বার্ষিক অর্জিত ছুটির পাশাপাশি বিনা বেতনে দুই মাস ছুটি নেই। সবার পক্ষে বিনা বেতনে ছুটি পাওয়া ও নেওয়া সম্ভব না।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০১২ সালে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাস করার প্রজ্ঞাপন জারি করে। তখন থেকেই তা কার্যকর হয়েছে বলে জানা গেছে। একই বছর বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ছুটি ছয় মাস করতে বলে। তবে কয়টি প্রতিষ্ঠানে তা মানা হচ্ছে, সে পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি। তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ বলছে, দেশে প্রায় ৪ হাজার ২০০ পোশাকশিল্প কারখানায় ৪৪ লাখ শ্রমিক কাজ করেন। এতে ৮০ শতাংশই নারী শ্রমিক। গত বছরের জানুয়ারি থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত ৩ হাজার ২৫৫টি পোশাকশিল্প কারখানা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রসূতি কল্যাণ ছুটি ও ভাতা দেওয়া হয় ৮২ দশমিক ৭০ শতাংশ কারখানায়। প্রয়োজনীয় সরঞ্জামসহ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আছে ৬৬ দশমিক ২৭ শতাংশ কারখানায়। বিজিএমইএর পক্ষ থেকে যদিও বলা হয় যে, "বেশির ভাগ কারখানায় নারী শ্রমিক মাতৃত্বকালীন ছুটি পাচ্ছে। এত বড়ো খাত, কিছু খারাপ মানুষ থাকতেই পারে, যারা এ ছুটি দিচ্ছে না। এ ছাড়া সরকারি কর্মজীবী মায়েরা ছয় মাস পেলেও আমরা শ্রম আইন মেনে শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি চার মাসসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছি।"

তবে বেশির ভাগ কারখানায় চার মাস ছুটি দেওয়া হয় না বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় গার্মেন্টস দর্জি শ্রমিক জোটের নারী কমিটির জেনারেল সেক্রেটারী। তিনি বলেন, 'যারা স্বেচ্ছায় চার মাস ছুটি দিচ্ছে, তারা বেতন দেওয়ার ক্ষেত্রে টালবাহানা করতে থাকে। মাসিক বেতন আট হাজার টাকা হলে মাতৃত্বকালীন ছুটির সময় দেওয়া হচ্ছে চার হাজার টাকা।'

❖ **সন্তানকে কার কাছে রেখে অফিসে যাব?**

প্রথমবার মা হওয়ার পর থেকে এ কথাই ভাবছিলেন এক কর্মজীবী নারী। কর্মস্থল থেকে তিনি বেতনসহ চার মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি পেয়েছিলেন। বিনা বেতনে ছুটি নিয়েছেন আরও দুই মাস। এরপর কী হবে? সে চিন্তায় অস্থির এই মা।

বর্তমান আইনে নারীর মাতৃত্বকালীন ছুটি ও সুবিধার বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া উচিত। একজন নারী শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও সক্ষমতার বিষয়টি আইনে মোটামুটি গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু প্রশ্নটি হলো বাস্তবায়নের। যেকোনো আইন বাস্তবায়ন না হলে তার কোনো মূল্য নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারী শ্রমিক তার জন্য নির্ধারিত সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকছে।

মা হওয়ার পর এই চিন্তায় ভোগে কম-বেশি সবাই। উন্নত-অনুন্নত সব দেশেই মাতৃত্বকালীন ছুটি নিয়ে এক ধরনের কার্পণ্য দেখা যায়। মুখে নারী অধিকারের কথা বললেও মা তার সন্তানকে কোথায় কিভাবে , কার কাছে রেখে যাবেন, তা নিয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কর্তৃপক্ষ থাকেন উদাসীন।

❖ সমস্যা /সংকট উত্তরনের উপায়

একথা সত্যি যে, পোশাক খাতের উন্নয়নের জন্য দেশের তৃণমূল পর্যায়ের নারীরা অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল হয়েছে। কিন্তু স্বল্পতম মজুরিতে কাজ করা এ শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে অধিকারের বিষয়টি এখনো যথাযথ গুরুত্ব পায়নি। ফলে কিছুটা অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন হলেও অধিকারের স্বীকৃতি মিলেনি। এ খাতে শ্রমিকেরা অনেক বেশি নিগ্রহ, বঞ্চনা আর বৈষম্যের শিকার হন। নিজেদের আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে তাদের অনেক বেশি মূল্য দিতে হয়। নারীর জন্য এ পথ আরও বন্ধুর।

বর্তমান আইনে নারীর মাতৃত্বকালীন ছুটি ও সুবিধার বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া উচিত। একজন নারী শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও সক্ষমতার বিষয়টি আইনে মোটামুটি গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু প্রশ্নটি হলো বাস্তবায়নের। যেকোনো আইন বাস্তবায়ন না হলে তার কোনো মূল্য নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারী শ্রমিক তার জন্য নির্ধারিত সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকছে।

১. এ জন্যে এ আইন সম্পর্কে নারী শ্রমিকদের নিজেদের জানতে হবে /সচেতনতা বাড়াতে হবে।

২. কর্মক্ষেত্রে গর্ভবতী মায়ের জন্য নিরাপদ কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

৩. প্রসূতি মায়ের মাতৃত্ব ছুটি আদায়ের ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা রাখতে হবে।

৪. মাতৃত্ব সুবিধা ভাতা প্রদানে মালিক পক্ষ কোনো রকম গরিমশি গ্রহনযোগ্য হবে না। প্রয়োজনে তাদের আইনের আওতায় আনতে হবে। এক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে আইনগত সাপোর্ট দিতে পারে।

৫. প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মায়েদের সন্তানদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রতি লক্ষ্য রেখে ডে কেয়ার সেন্টার বা শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র স্থাপন করা যা আইনে থাকলেও বাস্তবে খুব কম প্রতিষ্ঠানেই তা লক্ষ্য করা যায়।

৬. নারী শ্রমিকদের জন্য আবাসন ও নিরাপদ পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

৭. জরুরী প্রয়োজনে মাতৃত্বকালীন সময়ের জন্য ঋণ সুবিধার ব্যবস্থা রাখা।

৮. মাতৃত্বকালীন ছুটির জন্য নারী শ্রমিকদের এমন নিরাপদ কর্ম পরিবেশ প্রদান করতে হবে যাতে করে তাকে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই চাকুরী ছেড়ে দিতে বাধ্য হতে না হয়।

৯. দ্বিতীয় সন্তানের পর থেকে এ সুবিধা বঞ্চিত করা অমানবিক। কারণ কোনো সন্তান মহান রবের হুকুম ব্যতীত এ পৃথিবীতে আসার ক্ষমতা রাখেনা।

১০. মাতৃত্বকালীন ছুটি প্রদানের ক্ষেত্রে মালিক পক্ষের সদিচ্ছা এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

সর্বোপরি মনিটরিং ব্যবস্থাকে জোড়ালো করতে হবে। তবে, আইনের এ বাস্তবায়নের ঘাটতির জন্য সকল সময় কেবল একা মালিককে দায়ী করা যায় না। শ্রমিকরা তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন না হওয়াও এর বড় কারণ। মালিক-শ্রমিক অধিকার ও শ্রমপরিবেশ পুরো বিষয়টি অবিচ্ছিন্ন। সংশ্লিষ্ট সবাইকেই আইনানুযায়ী নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে এগিয়ে আসতে হবে। সেই সাথে এটাও মনে রাখতে হবে যে, নারীর শ্রমের মর্যাদা না দিয়ে নারীর সামাজিক উন্নয়ন কোনোভাবেই সম্ভব না। কর্মক্ষেত্রে নারীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তার সাথে সাথে পারিবারিক ও স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তার বিষয়টিও বিবেচনায় আনতে হবে। এক্ষেত্রে তার অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে হবে। সর্বত্র প্রচলিত ধ্যান ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়ে কর্মজীবী নারী অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সবাই মিলে এগিয়ে আসতে হবে তবেই কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সেক্টরে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারী উন্নয়ন তথা নারীর পূর্ণাঙ্গ অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। মনে রাখতে হবে কর্মজীবী নারী ও তার শিশুকে অরক্ষিত ও অবমূল্যায়ন করে তাদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত করে, জীবনমান অনুন্নত রেখে দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই কর্মক্ষেত্রে নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে, বৈষম্যহীন একটি নারী বান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবী।

লেখিকা: বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ও আইনজীবী

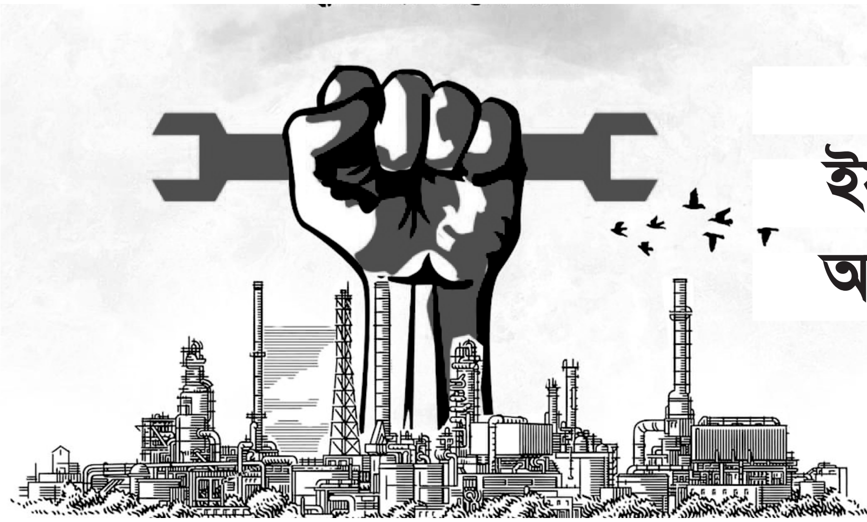

ইসলামে শ্রমিকের অধিকার ও মর্যাদা

আলী আহমাদ মাবরুর

সাম্প্রতিক সময়ে শ্রমিকদের অধিকারের বিষয়টি সর্বত্র ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। মুসলিম স্কলার এবং ইসলামী চিন্তাবিদগণের এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা প্রয়োজন। রাষ্ট্র ক্ষমতায় কাজ করার সুযোগ পেলে ইসলামী মনোভাব সম্পন্ন দল বা ব্যক্তিরা কি করবেন তা নিয়ে সুস্পষ্ট নীতিমালা আগে থেকেই নির্ধারন করা উচিত। মুসলিম দেশগুলোর সরকার ও কোম্পানীগুলোর দায়িত্ব হলো শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন ও বিধি বিধান প্রণয়ন করা। আবার শুধু আইন প্রণয়ন করাই যথেষ্ট নয়- এগুলোর যথাযথ বাস্তবায়নও নিশ্চিত করা চাই।

ইসলাম মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি ধাপে ন্যায়বিচার, ইনসাফ, স্বচ্ছ লেনদেন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব প্রদান করে। একটি সমাজে যদি ন্যায়বিচারই না থাকে তাহলে সেখানে সামঞ্জস্য বা ভারসাম্য থাকতে পারে না। আর পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম কোনো বিশেষ শ্রেণি বা গোষ্ঠী নয় বরং সমাজের সব মানুষের জন্যই ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে চায়। ইসলামের মূল চেতনার অনুসারী হিসেবে আমাদেরও উচিত যাতে সততা, ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা এবং শান্তির মতো বিষয়গুলো জীবনের সর্বস্তরে নিশ্চিত করা যায়। কেননা আল্লাহ আল কুরআনে মানুষকে ন্যায়বিচার করার জন্য তাগিদ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার-মিমাংসা করতে আরম্ভ কর, তখন মিমাংসা কর ন্যায়ভিত্তিক। আল্লাহ তোমাদেরকে সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সব কিছু দেখেন।" (সুরা আন নিসা: আয়াত ৫৮)

আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকেই এ পৃথিবীতে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। যদি আমরা ন্যায়বিচার ও সমতা ভিত্তিক একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই তাহলে সর্বাবস্থায় ঈমানী চেতনার ভিত্তিতে কাজ করার মানসিকতা লালন করা অপরিহার্য। ইনসাফ বা ন্যায়বিচারকে আল কুরআনে দুটো শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়। একটি হলো আল আদল আর অপরটি আল "কিসত"। "আদল" মানে হলো ভারসাম্যপূর্ণ পথ অনুসরণ করা। কোনো বিষয়ে চরমপন্থা অবলম্বন না করা। কোনো কিছু নিয়ে অতিরিক্ত ব্যয় না করা, আবার জরুরি বিষয়কে অবহেলা না করা। অন্যদিকে, "কিসত" হলো এটি স্বীকার করা যে, পৃথিবীতে সকল মানুষের সমান অধিকার। প্রতিটি মানুষকে তার প্রাপ্যটুকু দেওয়াই হলো ন্যায়বিচার। অন্যকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করাই হলো অনাচার। আল্লাহ পাক কুরআন পাকে ইরশাদ করেন,

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক; আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্যদান কর, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও। কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ তাদের শুভাকাঙ্খী তোমাদের চাইতে বেশী। অতএব, তোমরা বিচার করতে গিয়ে নফসের কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলো কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে মনে রাখবে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ কর্ম সম্পর্কেই অবগত।" (সুরা নিসা: আয়াত ১৩৫)

প্রতিটি মানুষ সমান। কে কোন বংশের বা গোত্রের বা দেশের তা বিবেচ্য হবে না। যারাই কাজ করবেন তাদেরকে সম্মান করা উচিত। সমভাবে মূল্যায়নও করা উচিত। আল্লাহ পাক বলেন,

"হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তারপর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।" (সুরা হুজুরাত: আয়াত ১৩)

রাসুল (সা.) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন, "হে মানব সকল। তোমাদের রব একজন। আদি পিতাও হযরত আদম (আ.)। মনে রাখবে, আরবের ওপর অনারবের কিংবা অনারবের ওপর আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। সাদার ওপর কালোর এবং কালোর ওপর সাদার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। মানুষের মর্যাদা পাওয়ার একমাত্র মাপকাঠি হলো তার তাকওয়া।" (মুসনাদে আহমাদ)

ইসলাম কাজ করা অর্থাৎ পরিশ্রম করাকে খুবই গুরুত্ব দেয়। যারা পরিশ্রম করে আয় করে ইসলাম তাদের সম্মানের সাথে বিবেচনা করে। তবে মনে রাখতে হবে, কাজ যাই হোক, তা করতে হবে সততা ও নিষ্ঠার সাথে। সব ধরনের অসামাজিক কর্মকান্ড, দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ এবং প্রতারণা ও ঠগবাজি ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মালিক ও শ্রমিক উভয়কেই সৎ হতে হবে। মালিক ও শ্রমিককে পরস্পরের প্রতি ইনসাফ নিশ্চিত করতে হবে।

শ্রম ও শ্রমিকের বিষয়ে উচ্চ মর্যাদা :

ইসলাম কাজ করা অর্থাৎ পরিশ্রম করাকে খুবই গুরুত্ব দেয়। যারা পরিশ্রম করে আয় করে ইসলাম তাদের সম্মানের সাথে বিবেচনা করে। তবে মনে রাখতে হবে, কাজ যাই হোক, তা করতে হবে সততা ও নিষ্ঠার সাথে। সব ধরনের অসামাজিক কর্মকান্ড, দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ এবং প্রতারণা ও ঠগবাজি ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মালিক ও শ্রমিক উভয়কেই সৎ হতে হবে। মালিক ও শ্রমিককে পরস্পরের প্রতি ইনসাফ নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিকদের সম্মান করার বিষয়টি ইসলামের মৌলিক একটি শিক্ষা। এক্ষেত্রে ৫টি বিষয়কে ইসলাম গুরুত্ব প্রদান করেছে। এগুলো হলো:

১. পরিষ্কার এবং যথাযথ চুক্তি

মৌখিক হোক বা লিখিত সকল চুক্তিই পরিষ্কার, স্বচ্ছ ও স্পষ্ট হতে হবে। চুক্তিকে হতে হবে ইনসাফপূর্ণ এবং ন্যায়সঙ্গত। শ্রমিকেরা যেমন তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানবে, ঠিক একইভাবে তাদেরকে প্রাপ্য অধিকার ও সুযোগ সুবিধাও জানাতে হবে। বিশেষত, তারা কতটা ছুটি পাবেন, কী সুবিধা পাবেন, কতটা আর্থিক ছাড় পাবেন সবই উল্লেখিত থাকবে। আল্লাহ পাক কুরআনে বলেন, "হে ঈমানদারগণ, তোমরা চুক্তিগুলো যথাযথভাবে সম্পাদন করো। (সুরা মায়েদাহ: আয়াত ১)

অন্যদিকে, রাসূল (সা.) বলেন, "মুসলিমদেরকে অবশ্যই চুক্তির প্রতি দ্বায়বদ্ধ থাকতে হবে। যতক্ষন না হারাম কোনো চুক্তি না হয় বা হালালকে হারাম বানিয়ে ফেলা হয়, ততোক্ষন পর্যন্ত চুক্তিকে মেনে যেতেই হবে।" (আত তিরমিজি) এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, হারাম বা অবৈধ কোনো শর্তে চুক্তি করা হলে ইসলাম তা অনুমোদন করে না। কর্মচারী ও নিয়োগকর্তা- উভয়েরেই দায়িত্ব হলো চুক্তি মেনে চলার জন্য সাধ্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ চেষ্টা করা।

১. শ্রমিকদের সম্মান ও মর্যাদা:

ইসলামিক আইন সকল মানুষকেই আইনসঙ্গত পেশা বেছে নেয়ার সুযোগ ও অধিকার প্রদান করেছে। প্রতিটি শ্রমিকের মর্যাদা ও সম্মান সুনিশ্চিত করতে হবে। রাসূল (সা.) সবসময়ই অলস ব্যক্তিদের তুলনায় কর্মক্ষম ও পরিশ্রমী মানুষগুলোর প্রশংসা করেছেন। সামর্থ্যবান ব্যক্তিদেরকেও ইসলাম আলাদা করে তাগিদ দিয়েছে, যাতে তারা অধীনস্থ কর্মচারীদের সাথে সহানুভূতিশীল আচরণ করে। আল্লাহ পাক বলেন,

"আর ইবাদত কর আল্লাহর, অন্য কাউকে তাঁর সাথে শরীক করো না। পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম-মিসকীন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক-গর্বিতজনকে পছন্দ করেন না। যারা নিজেরাও কার্পন্য করে এবং অন্যকেও কৃপণতা শিক্ষা দেয় আর গোপন করে সে সব বিষয় যা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দান করেছেন স্বীয় অনুগ্রহে। বস্তুতঃ আমি তৈরী করে রেখেছি কাফেরদের জন্য অপমানজনক আযাব।" (সুরা নিসা: আয়াত ৩৬-৩৭)

১. শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ:

মালিক শ্রমিক পরস্পর ভাই ভাই। তারা আমাদের জন্য সহায়ক শক্তি। সুষ্ঠুভাবে আমাদের জীবন যাপনের ক্ষেত্রে অন্যতম হাতিয়ার। শ্রমিক ছাড়া কোনো সমাজ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। সমাজের উত্থান ও বিকাশের জন্য শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। যাপিত জীবনের বহু কিছুর জন্যই আমরা তাদের ওপর নির্ভরশীল। শ্রমিকেরা যেভাবে পরিশ্রম করে গোটা সমাজ-সভ্যতাকে ধরে রেখেছে, তা অনেক শিক্ষিত বা অর্থশালী লোক হয়তো কল্পনাও করতে পারবে না।

শ্রমিকদেরকে তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত কোনো কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। তারা যেন সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারে এ জন্য কর্মস্থলে স্বাস্থ্যকর ও শ্রমিকবান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে হবে। কাজ করতে গিয়ে যদি তাদের কোনো ক্ষতি হয় সেই জন্য কালবিলম্ব না করে, আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় না ফেলে তাদেরকে দ্রুততার সাথে

ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিতে হবে। তাদেরকে শুধু কাজ আর কাজ দিয়ে গেলেই হবে না। কাজগুলো যেন যথাযথভাবে করতে পারে সেইজন্য সময়ও দিতে হবে। আবার কর্মস্থলে নির্ধারিত সময় দেওয়ার পর তারা যেন পরিবারকেও ভালোভাবে সময় দিতে পারে সেই সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। বাড়তি কাজ করলে তাদের ওভারটাইম দিতে হবে। মালিক পক্ষের উচিত বিভিন্ন হাসপাতাল, ডায়াগনস্টিকসহ সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতায় আসা, যাতে তার অধীনস্ত শ্রমিকেরা প্রয়োজনে এ সকল প্রতিষ্ঠানের সেবা পেতে পারে। শিশুদেরকে কখনোই কঠোর পরিশ্রম ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে সম্পৃক্ত করা যাবে না।

নারী শ্রমিক যারা আছেন, তাদেরকে নিরাপদ ও ধর্ম পালনের মতো সহায়ক পরিবেশ দিতে হবে। ধর্মীয় পোশাক বা হিজাব বা বোরখা নিয়ে কোনো ধরনের হয়রানি করা যাবে না। নারীদের জন্য অনুপোযোগী পরিবেশে নারীদের কাজে পাঠানো যাবে না। তাদের ওয়াশরুমগুলো পৃথক হবে এবং সেখানে পুরুষরা যাতে না যেতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। নারীদেরকে মাতৃত্বকীন ছুটি দিতে হবে এবং বেতনের বিনিময়েই দিতে হবে। আবার ছোট সন্তানদের বাসায় রেখে আসার সুযোগ যাদের নেই, তাদের জন্য কর্মস্থলেই শিশু প্রতিপালনের বন্দোবস্ত করতে হবে। রাসূল (সা.) বলেছেন, "তোমাদের ভাইদের প্রতিও তোমাদের দায়িত্ব রয়েছে। তাই তোমার ভাই যে খাবার খেতে চায় তাকে সেই খাবারই দিতে হবে। যে মানের পোশাক চায় তাকে তাই দিতে হবে। তোমরা শ্রমিকদের জন্য বোঝা হয় এতটা কাজের চাপ তাদের ওপর দিও না। যদি কখনো পরিস্থিতির কারণে তাদেরকে বাড়তি কাজ দিতেও হয়, তাহলে তাদেরকে সহায়তা করার জন্য বাড়তি লোকের ব্যবস্থা করবে।" (বুখারি)

৪. সময়মতো এবং যথাযথ পারিশ্রমিক প্রদান করা:

শ্রমিকদেরকে অবশ্যই ন্যায্য ও যথাযথ পারিশ্রমিক প্রদান করতে হবে। কোনো মানুষকে শোষণ করার সুযোগ ইসলামে নেই। আল্লাহ বলেন, "আমি মাদইয়ান বাসীর প্রতি তাদের ভাই শোয়াইবকে প্রেরণ করেছি। সে বলল: হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে প্রমাণ এসে গেছে। অতএব তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ণ কর এবং মানুষকে তাদের দ্রব্যদি কম দিয়ো না এবং ভূপৃষ্ঠের সংস্কার সাধন করার পর তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। এই হলো তোমাদের জন্যে কল্যাণকর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।" (সুরা আল আরাফ: আয়াত ৮৫) আল্লাহ তাঁআলা মাপে কম দেওয়া ব্যক্তিদের কঠোর সমালোচনা করে আল কুরআনে বলেন, "যারা মাপে কম করে, তাদের জন্যে দুর্ভোগ, যারা লোকের কাছ থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পূর্ণমাত্রায় নেয় এবং যখন লোকদেরকে মেপে দেয় কিংবা ওজন করে দেয়, তখন কম করে দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে। সেই মহাদিবসে, যেদিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্ব পালনকর্তার সামনে।" (সুরা মুতাফফিফিন: আয়াত ১-৬)

শ্রমিকদেরকে নির্দিষ্ট সময়ে পারিশ্রমিক দিতে হবে। রাসূল (সা.) বলেছেন, "শ্রমিকদের ঘাম শুকানোর আগে তাদেরকে শ্রমের মূল্য দিয়ে দাও।" (ইবনে মাজাহ) ইদানিং প্রশাসনিক পর্যায়ে ন্যূনতম পারিশ্রমিকের কথা বেশ জোরের সাথে বলা হচ্ছে। আবার ন্যূনতম পারিশ্রমিক বলতে যে টাকা দেয়া হয় তা স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য মোটেও যথেষ্ট নয়। ন্যূনতম পারিশ্রমিকের বিষয়ে ইসলামের একটি অবস্থান রয়েছে। তাত্ত্বিকভাবে বলতে গেলে সঠিক পারিশ্রমিক হলো এমন একটি পরিমাণ যা শ্রমজীবী মানুষটির অবদান তথা পরিশ্রমের সাথে সমানুপাতিক। তবে, ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে পরিশ্রমের মূল্যমান নির্ধারন করা সবসময়ই বেশ কঠিন একটি বিষয়।

বেশ কিছু হাদিস পাওয়া যায় যেখানে ন্যূনতম আর আদর্শ মানের পরিশ্রমিক সম্বন্ধে একটি ধারনা পাওয়া যায়। রাসুল (সা.) বলেছেন, একজন শ্রমজীবীর (পুরুষ কিংবা নারী) অন্তত এটুকু সামর্থ্য থাকতে হবে যাতে সে মানসম্পন্ন খাবার খেতে পারে, প্রয়োজনীয় পোশাক পরিধান করতে পারে। তার ওপর এমন কোনো পরিশ্রমের কাজ চাপিয়ে দেওয়া যাবে না- যা সে বহন করতে পারে না।" (মালিক,মুআত্তা: কায়রো সংস্করণ: ৯৮০ পৃষ্ঠা) এ হাদিস থেকে ন্যূনতম মজুরির একটি সংজ্ঞা পাওয়া যায়। শ্রমজীবীকে এতটুকু পারিশ্রমিক দিতে হবে যাতে সে তার নিজের ওপর জুলুম না করেও বেঁচে থাকার মতো প্রয়োজনীয় খাবার ও পোশাক সংগ্রহ করতে পারে। রাসুল (সা.) এর সাহাবিগণ এ পরিমান পারিশ্রমিককেই ন্যূনতম বলে বিবেচনা করেছেন। কারণ তারা মনে করতেন যে, মুসলিম সমাজের আধ্যাত্মিক মান বজায় রাখার জন্যেও এটুকু মজুরি নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৫. ইউনিয়ন গঠনের স্বাধীনতা:

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা এ সিদ্ধান্তেও উপনীত হতে পারি যে, ইসলাম ইতিবাচক উদ্দেশ্যে যেকোনো সংস্থা বা সংগঠন এবং ইউনিয়ন গঠনের বিষয়টি অনুমোদন করে। কেননা, এ সকল ট্রেড ইউনিয়নগুলো শ্রমিকদেরকে তাদের কার্যক্রম পরিচালনায় এবং অধিকার রক্ষায় সহায়ক হয়। শ্রমিকেরা এই সংগঠনগুলোর মাধ্যমে সামাজীকিকরণের একটি সুযোগ পায়। একইসঙ্গে, এই সংগঠনগুলো শ্রমিকদেরকে ইনসাফ পেতে সাহায্য করে। নিজেদের প্রাপ্যগুলো ফিরে পাওয়া নিশ্চিত হয়। সর্বোপরি, মালিক ও শ্রমিক সবাইকেই নিজ নিজ অধিকার প্রাপ্তি এবং অপরের অধিকারটুকু দেওয়ার জন্য আল্লাহকে ভয় করে চলতে হবে।

সাম্প্রতিক বাস্তবতা ও ইসলামের অবস্থান:

আমাদের দেশে প্রায়শই গার্মেন্টসসহ অন্যান্য কল কারখানায় অগ্নিকান্ডসহ নানা ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে। এসব ঘটনায় প্রতিবছর অসংখ্য শ্রমিক নিহত হয়। যেকোনো দুর্ঘটনা হলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দিয়ে বিষয়টি মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করা হয়। আর প্রশাসনিক পর্যায়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এ সব তদন্ত কখনো শেষ হয় না। যে কমিটিগুলোর তদন্ত কার্যক্রম শেষ হয়, তার পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন কখনো জনগনের সামনে প্রকাশিত হয় না। আর তদন্ত কর্মকর্তারা যেসব সুপারিশমালা প্রদান করেন, সেগুলোও বাস্তবায়িত হয় না। এভাবেই চলে আসছে বছরের পর বছর। অনেক সময় ঘটনা পরিক্রমায় কারখানার মালিকের দোষ ও সিস্টেম বহির্ভূত কর্মকান্ড ধরা পড়লেও মালিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয় না। দু একবার কারাগারে গেলেও এই মালিকেরা

দিন কয়েক পরই আইনের ফাঁক-ফোকড় দিয়ে বের হয়ে আসে। তারা আবার আগের মতোই অনিয়ম শুরু করে। বিভিন্ন দুর্ঘটনার পর দাতা সংস্থার তরফ থেকে কমপ্লাইন্স প্রয়োগ করার কথা বলা হলেও কারখানার মালিকেরা এ বিষয়টি নিয়েও লুকোচুরি খেলে।

ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম এবং নবি মুহাম্মাদ (সা.) মানবতার জন্য নেয়ামত হিসেবেই প্রেরিত হয়েছিলেন। ইসলাম শ্রমিক ও কর্মচারীসহ সকলের অধিকার পূরণে শিক্ষা দেয়। দুনিয়ায় কাজের প্রয়োজনে কেউ হয়তো মালিকপক্ষ আর কেউ বা শ্রমিক হয়। তবে, মালিককে শ্রমিকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর মনে করার সুযোগ নেই। বরং মালিকেরা তাদের পুরুষ ও নারী শ্রমিকদেরকে ভাই-বোন হিসেবে বিবেচনা করবেন। অফিসের বসকে তার অধীনস্ত শ্রমিকদের অধিকারগুলোও পূরণ করতে হবে। কালামে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, “তারা কি আপনার রবের রহমত বণ্টন করে? আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন করেছি পার্থিব জীবনে এবং একের মর্যাদাকে অপরের ওপর উন্নীত করেছি, যাতে একে অপরকে সেবক রূপে গ্রহণ করে। তারা যা সঞ্চয় করে, আপনার রবের রহমত অপেক্ষা উত্তম।” (সুরা যখরুফ: আয়াত ৩২)

মালিকপক্ষ শ্রমিকদের সাথে ন্যূনতম যে ইনসাফটি করতে পারে তাহলো তারা শ্রমিকদেরকে সঠিক সময়ে সততার সাথে নির্ধারিত পারিশ্রমিকটি দিয়ে দিতে পারে। রাসূল (সা.) নিজেও তার অধীনস্তদের সাথে উন্নত আচরণের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তিনি তার খাদেম আনাস বিন মালেকের রা. সাথে নিয়মিত মেঝেতে বসেই খেতেন। এই আনাস বিন মালেক রা. টানা ১০ বছর নবিজির (সা.) খেদমত করেছেন। পরবর্তীতে তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, এই ১০ বছরে নবি (সা.) একটিবারের জন্যেও তাকে পরিহাস করেননি, হেয় করেননি। যখন আমি কোনো কাজ করেছি, তখনও সেই কাজের ধরন নিয়ে তিনি কোনো প্রশ্ন তুলেননি। আর যখন আমি কোনো কাজ করতে পারিনি, তখন তিনি আমার ব্যর্থতা নিয়েও কিছু বলেননি। শিষ্টাচারে ও আচরণে তিনি ছিলেন সবার ওপরে।” (বুখারি: ৫৬৯১, মুসলিম ২৩০৯)

এবার আমাদের সমাজের দিকে লক্ষ্য করুন। সিংহভাগ মুসলিমই শ্রম অধিকারের বিষয়টি অবজ্ঞা করছেন। শ্রমিকদেরকে অনেকেই যথাযথ গুরুত্ব দিতে পারছেন না। আমাদের বাসা বাড়ি বা অফিস আদালত, কল কারখানা- সবখানেই অধীনস্ত শ্রমিকেরা লাঞ্ছিত ও হয়রানির শিকার হচ্ছে। যদিও ইসলাম অধীনস্তদের একই খাবার ও পোশাক দেওয়ার কথা বলছে, কিন্তু আমাদের অনেক বাসাতেই গৃহকর্মীরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। কয়েকদিন পরপরই পত্র পত্রিকায় গৃহপরিচারিকাদের নির্মম নির্যাতনের খবর পাওয়া যায়। লজ্জাজনক হলেও সত্য, এই নির্যাতনগুলো করছে সমাজেরই তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানুষজন। নির্যাতন ছাড়াও আরও নানাভাবে অধীনস্তদের বঞ্চিত করা হয়। সপ্তাহে একদিন ছুটি দেওয়া বা ঈদের সময় বা মাসিক ছুটি দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের অনীহা প্রবলভাবেই লক্ষ্য করা যায়। অনেকেই আছেন, যারা গাড়িতে চলাচল করছেন, তারা তাদের ড্রাইভারদের খবরও রাখছেন না। আমি বহু দৃষ্টান্ত দেখেছি, যেখানে গাড়ির মালিক হয়তো কোনো রেস্টুরেন্টে বা বিয়ের প্রোগ্রামে খাচ্ছেন আর ড্রাইভার নীচে না খেয়েই অপেক্ষা করছে। আবার এমনও দেখেছি, কেউ কেউ ড্রাইভারকে খেয়ে নেওয়ার জন্য টাকা দিচ্ছে, কিন্তু এই টাকার পরিমাণ এতটাই কম যে তা দিয়ে কিছু খাওয়াও যায় না। আবার অধীনস্তরা গর্ভবতী হলেও তাদের ছুটি দেয়ার বিষয়েও অনেক অনাগ্রহ থাকে। পোশাক পরিচ্ছদ দেওয়ার ক্ষেত্রেও আমরা অনেকেই উদার নই। আমরা যেন ধরেই নিয়েছি, বাড়ির সব নোংরা ও পুরনো কাপড়গুলোই যেন অধীনস্তদের জন্য বরাদ্দ থাকে। আবার গৃহকর্মীদের কথ যদি ভাবি, বাসী আর পুরনো খাবার ছাড়া তাদেরকে ভাগ্যে যেন কিছু জোটেই না। কল কারখানার কথা যদি বলি, আমরা আমাদের শ্রমিকদের বিষয়ে যথেষ্ট উদাসীন। বেশিরভাগ শ্রমিকই খুবই অস্বাস্থ্যকর ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করে। অনেক শ্রমিক আছে যারা কাজে যোগ দেওয়ার আগে নিজেদের কাজ সম্বন্ধে জানারও সুযোগ পায় না। আবার অনেকেই আছে, যারা একটি কাজের কথা শুনে কাজে যোগ দিয়েছে কিন্তু পরে কর্মক্ষেত্রে গিয়ে দেখেছে অন্য কাজ, অথচ তখন আর সেখান থেকে বের হওয়ার সুযোগ পায়নি। বেশিরভাগ শ্রমিকের সাথেই কাজের আগে বেতন, সুযোগ সুবিধা নিয়ে কোনো চুক্তি করা হয় না। বেতন নির্দিষ্ট করা হয় না আর হলেও পূর্ণাঙ্গ বেতন দেওয়া হয় না।

অনেক মালিকই এসব অনাচার জেনে বুঝে করেন, কারণ তাদের ধারণা যে, শ্রমিকেরা অলস এবং তারা চাইলে আরও ভালো করে কাজ করতে পারে। মালিকেরা অধীনস্তদেরকে ফাঁকিবাজ বলেও মনে করে। নানা শ্রমিক সংগঠন ও দাতা সংস্থার চাপে সরকার যদি শ্রমবান্ধব কোনো আইন প্রনয়নও করে, মালিকেরা তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে চায় না। বিশেষ করে, কলকারখানার মালিকেরা নানা কৌশলে এসব বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া থেকে বেরিয়ে যেতে চায়।

আমাদের দেশের আরেকটি বড়ো সংকট হলো শিশুশ্রম। বারবার নানা জায়গা থেকে এ বিষয়ে বলা হলেও কিংবা বিভিন্ন ধরনের আইন প্রণয়নের পরও শিশু শ্রম বন্ধ হয়নি। জাতি হিসেবে এ লজ্জার ভার আমাদের সকলকেই বহন করতে হবে। অসংখ্য শিশু ঝুঁকিপূর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। আমরা তাদের নিরাপত্তা দিতে পারছি না। শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করছি। এই দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামের মূল চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক। আন্তর্জাতিক শ্রম আইন মাত্র কয়েক বছর আগে চালু হয়েছে। অথচ ইসলাম আজ থেকে ১৫শ বছরবছর আগেই শ্রমিকদের অধিকারের কথা বলেছে। তৎকালীন সময়ে ক্রীতদাস প্রথা সমাজে গেঁড়ে বসলেও ইসলাম ধাপে ধাপে তা বিলুপ্ত করেছে। অথচ এই ইসলামের অনুসারীরা শ্রমিকদের অধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে কার্পন্য করবে- তা কোনো অবস্থাতেই মেনে নেওয়া যায় না।

আমাদের সবাইকেই যেহেতু নিজের ও অধীনস্তদের সাথে আচরণের বিষয়ে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে, তাই এখন থেকেই শ্রম ও শ্রমিকদের অধিকারের বিষয়ে আমাদের সচেতন হওয়া উচিত। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সচেতন হওয়ার এবং রাসূলের (সা.) এর সুন্নাত অনুযায়ী শ্রমিকবান্ধব হওয়ার তাওফিক দিন। আমিন।

লেখক: সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

পলাশী বিপর্যয় : আজকের প্রেক্ষাপট

মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান

পলাশী ভাগ্যাহত এক নবাবের পরজয়ের দিন শুধু নয়, ইতিহাসের বাঁক ঘোরানো রক্তাক্ত উপাখ্যান। একটি জাতির উত্থান পতনই শুধু নয় পৃথিবীর ইতিহাস পাল্টে দেওয়া এক দুষ্ট ক্ষতের নাম। পলাশীর থরো থরো স্মৃতি রোমন্থন অতীতের বেদনাগুলো সামনে এনে হাজির করে; এর বিপরীতে জীবন এবং জমিনের নতুন বীজ বপনে চেতনার আলোকচ্ছটাকে দ্যুতিময় করে। অতীত হয়ে যাওয়া দুঃসহ বেদনার সরল রেখাগুলো নানান বক্রতা, জটিলতা আর ধোয়াশায় ঘেরা; যা এ জাতিকে দু'শ বছরের গোলামীতে আবদ্ধ করেছিলো। উপমহাদেশের ইতিহাসে বিয়োগান্ত এ ঘটনা শুধু এই জনপদেরই নয় গোটা দুনিয়ার অর্থনীতি, রাজনীতি এবং বৈশ্বিক ব্যবস্থাপনায় এক সুদুরপ্রসারী প্রভাব রেখে গেছে। ইংরেজ শাসনের গোড়াপত্তনে তুর্কী খেলাফতের সাথে এই জনপদের বিচ্ছিন্নতাকে মোটা দাগে সুস্পষ্ট করে তুলেছে। প্রভাব পড়েছে ইরান আফগানিস্তান আর মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনীতি এবং অর্থনীতিতে। ইতিহাসের এ চড়াই-উতড়াই আর আশা-হতাশার ঘটনা-দুর্ঘটনাগুলো ভবিষ্যতের বুনিয়াদ গড়তে মানবগোষ্ঠীকে নিত্য নতুন চিন্তার দ্যোতনায় আন্দোলিত করে। ইতিহাস মানুষের বিশ্বাস এবং কর্মে প্রতিনিয়ত চিন্তার খোরাক যোগান দেয়। বর্তমানকে বিচার করে ভবিষ্যতের বুনিয়াদ গড়ার অপরিহার্য উপাদান ইতিহাস। পলাশীর বিয়োগান্ত ঘটনা আমাদের জাতিসত্তার সাথে অষ্টেপৃষ্ঠে লেগে থাকা এমন দুঃখ দিনের করুণ কাহিনী। পলাশীর দুঃসহ ঘটনা আমাদের ইতিহাস, আস্তিত্ব আর বিশ্বাসের শক্তিশালী ভীতগুলোকে নাড়িয়ে দিয়েছিলো, যার প্রভাব আজও নানাভাবে বিদ্যমান। দু'শ বছরের ইংরেজ গোলামীর অবসান ঘটলেও তার দুষ্ট ক্ষতের প্রভাব আমরা অনুভব করি প্রতিনিয়ত।

পলাশী শুধু একটি মাঠের নাম নয়। পলাশীর আম্রকানন শুধু কিছু আম গাছের সাড়ি নয়। ভাগীরথীর তীরের আম্রকাণনে দুই শক্তির লড়াইয়ের নামও পলাশী নয়। আপোষহীন নবাব সিরাজের স্মৃতিগাথা এ ময়দান। পলাশী মানে স্বাধীনতা রক্ষায় একদল সাহসী বীর, তার বিপরীতে অজস্র বিশ্বাসঘাতক আর বেঈমানের অট্টহাসি। জাতিসত্তার বিনাসে একদল বিশ্বাসঘাতকের ষড়যন্ত্রের ইতিহাস ধারণ করে আজও এ ময়দান কথা বলে। ভাগীরথীর সেই স্রোত নেই। নদীর দুই পারের মানুষগুলো নেই। সেই সময়ের কৃষকরা নেই। কৃষি নির্ভর গ্রামীণ জনপদের সাড়ি সাড়ি বাড়ি আর মুর্শিদাবাদের রাজদরবারের কলা-কোলাহল নেই। এর পরও অসংখ্য স্মৃতি ধারণ করে ইতিহাস সচেতন মানুষগুলোর হৃদয়ে পলাশী নিয়ত চেতনার বহ্নি জ্বালায়। স্বাধীনতাকামী মানুষের মানসপটে পলাশী মানে প্রতিনিয়ত বিদ্রোহ আর যুদ্ধের দামামার মাঝে স্বাধীনতা রক্ষার অঙ্গীকার। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাস করা মীর জাফর, উমিচাঁদ, ঘষেটি বেগমদের বিরুদ্ধে দ্রোহ। পলাশী আমাদের চিনিয়ে দিয়েছে নায়ক আর খলনায়কের শ্রেণি চরিত্রকে। পর্দার আড়ালে বাস করা কালো কেউটে, বিষধর কালফনি আর হিংস্র শাপদের মুখোষ উম্মোচন করেছে পলাশী। রায় দুর্লভ, ইয়ার উদ্দিন, উমিচাঁদ, জগৎশেঠরা এখন আর কোনো ব্যক্তি সত্তার নাম ধারণ করে না। এ নামগুলো এক একটি বিশ্বাসঘাতকার প্রতীক।

পলাশী শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করার প্রেক্ষাপটকে উজ্জ্বল আলোয় নিয়ে এসেছিলো। পলাশীর স্মৃতিকে ধারণ করে তাই আজও বন্ধুরূপী বিশ্বাস ঘাতক আর বেনিয়ার চরিত্র ধারনকারী খলনায়কদের শ্রেণিচরিত্র বিশ্লেষণ করতে পারি। আধিপত্যবাদের দন্তনখর শুধু ফেলানীর লাশই উপহার দেয় না আমাদের স্বাধীনতা এবং সীমান্তকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। সাম্রাজ্যবাদের চতুর্মুখী হামলা আমাদের অস্তিত্ব আর বিশ্বাসের বট বৃক্ষের শেকড় কাটে প্রতিনিয়ত। সাহায্যের নামে এনজিও তৎপরতা, উন্নয়নের স্লোগানে চরিত্র বিনাশী কর্মকান্ড। সংস্কৃতি বিকাশের নামে জাতিসত্তা বিরোধী চরিত্রকে হাজির করা। সবই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। আড়াইশ বছরের বেশি সময় পেরিয়ে এলেও পলাশী এবং নবাব সিরাজকে নিয়ে নির্মোহ আলোচনা খুব কমই হয়েছে। ইতিহাসের পেছনের সবচেয়ে নির্মম সত্য হচ্ছে-বিজয়ীরাই ইতিহাস রচনা করে। যেখানে পরাজিত ব্যক্তির কথা স্থান পায় না। যদিও বা তাদের নাম চলে আসে তবে সত্যকে এড়িয়ে মিথ্যাকেই তাদের নামের সাথে জুড়ে

দেওয়া হয়। নবাব সিরাজের ব্যাপারেও সত্যের চেয়ে মিথ্যাকেই বেশি স্থান দেওয়া হয়েছে। একইভাবে পলাশীর বিয়োগান্ত ঘটনায় ষড়যন্ত্রের কুশীলব ব্রিটিশ বেনিয়ারা আজ ধোয়া তুলশীপাতা। পলাশী এবং নবাব সিরাজ সম্পর্কে সত্যাশ্রয়ী বই পুস্তক পাওয়া দুষ্কর। ইন্টারনেটে যা কিছু তথ্য পাওয়া যায় তার অধিকাংশই তথ্য বিকৃতি ছাড়া কিছুই নয়। অত্র নিবন্ধে ইতিহাসের অদ্যপান্ত লেখা যেমন সম্ভব নয়, একইভাবে ঘটনার কুশীলব সকলের বিবরণ তুলে ধরাও সম্ভব নয়। ইতিহাসের আলোর এ ক্ষীণধারা জাতিসত্তার অস্তিত্ব রক্ষায় বর্তমান এবং আগামী প্রজন্মকে চিরায়ত বিশ্বাস, আদর্শ, ঐতিহ্য, দেশপ্রেম আর স্বকীয়তা রক্ষায় নতুনভাবে উদ্ধুদ্ধ করবে এটাই প্রত্যাশা।

বিগত কয়েক শতাব্দীকাল অব্দি বিশ্বব্যাপী ইংরেজ, ফরাসী, ডাচ এবং ওলন্দাজ শক্তি গোটা দুনিয়ায় শক্তির বলে দেশ দখল এবং সম্পদ আহরণের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকে। আজ যারা নিজেদেরকে প্রথম শ্রেণির রাষ্ট্র বলে পরিচয় দিচ্ছে, তারা এক সময় অতি দরিদ্র রাষ্ট্রের কাতারে শামিল ছিল। বৃটেনের বর্তমান জৌলুসের পেছোনে তাদের দখলদারী আর আগ্রাসি বাণিজ্যিক কূট কৌশলই প্রধান উপজীব্য। বৃটিশ বণিকরা প্রথম ভারতীয় উপমহাদেশে আগমন করে বাণিজ্য উপলক্ষ্যে। তাদের বাণিজ্যিক লাভ লোভে পরিণত হয় এবং আস্তে আস্তে এ দেশের দন্ডমুণ্ডের কর্তা হওয়ার জন্য তারা নানা কূট কৌশল আর ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে। ষো'লশ খৃষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের একদল ব্যবসায়ী ইস্ট ইন্ডিজে ব্যবসা করার জন্য রাণী এলিজাবেথের সনদ লাভ করে। এ কোম্পানীর নাম ছিল "দি গভর্নর এন্ড মার্চেন্টস অব লন্ডন ট্রেডিং ইন টু ইস্ট ইন্ডিজ" বেশ কিছুকাল পর "দি ইংলিশ কোম্পানী ট্রেডিং ইন টু দি ইস্ট ইন্ডিজ" নামে আর একটি প্রতিদ্বন্দী বাণিজ্যিক গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউরোপের অন্যান্য বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর সাথে দুটি কোম্পানী এক হয়ে যায়। ঐক্যবদ্ধ কোম্পানীর নাম "দি ইউ-নাইটেড কোম্পানী অব মার্চেন্টস অব ইংল্যান্ড ট্রেডিং টু ইস্ট ইন্ডিজ" সংক্ষেপে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী।১ এই কোম্পানী ভারতীয় উপমহাদেশে একচেটিয়া ব্যবসা করার অধিকার লাভ করে। ব্যবসার মাধ্যমে তারা আহমদাবাদ, আগ্রা, হয়ে ক্রমে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়। এভাবেই আস্তে আস্তে তারা বাংলার নবাবী এলাকা এবং সমগ্র ভারত গ্রাস করে। ১৭৫৭ সালের ২৩ এপ্রিল ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কলিকাতা কাউন্সিল নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য এক প্রস্তাব পাশ করে। প্রস্তাব অনুযায়ী ক্লাইভ প্রথমে উমিচাঁদকে বসে আনে। উমিচাঁদ মীরা জাফরের সাথে যোগাযোগ করে তাকে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে শরীক করে। ষড়যন্ত্রকারীগণ জগৎশেঠের বাড়িতে এক বৈঠকে মিলিত হয়। ইংরেজ কোম্পানীর এজেন্ট ওয়াটস নিজের চেহারা ঢেকে মহিলাদের মতো পর্দা ঘেরা আসনে বসে এ বৈঠকে অংশগ্রহণ করে। বৈঠকে উমিচাঁদ রায় দুর্লভ, মীর জাফর, রাজবল্লভসহ বেশ কয়েকজন কর্তা ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এখানেই তারা এক চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তি অনুযায়ী মীর জাফর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে সকল প্রকার সহযোগিতা করতে সম্মত হয়।২

বাংলা বিহার উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব নবাব সিরাজউদ্দৌলা তার নানা আলীবর্দী খার মৃত্যুর পরে রাজ সিংহাসনে আসীন হন। নবাব সিরাজের দুঃখজনক পরাজয়ের জন্য অনেকেই তাঁর রাজনৈতিক অদূরর্শীতাকে দায়ী করেন। কেউ কেউ তো আগ বাড়িয়ে তাকে মদ্যপ এবং চরিত্রহীন বলতে দিধা করে না। অবশ্য ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ ইতিহাস এভাবেই লেখা হয়েছে। আপনি যদি ওপার বাংলায় যান কিংবা মুর্শিদাবাদে গিয়ে গ্রামের সাধারণ সহজ সরল কৃষকদের জিজ্ঞেস করেন সিরাজউদ্দৌলা কেমন লোক ছিল? অধিকাংশ লোকই নেতিবাচক উত্তর দিবে। এর কারণ বিজীতদের দ্বারা ইতিহাস রচিত হয়েছে আর সে ইতিহাসে পরাজিতদের চরিত্র হনন ছিল এক মৌলিক বিষয়। ড. মোহর আলী তার The History of Muslim of Bengal বইয়ে লিখেছেন, 'পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত পর থেকেই সিরাজ চরিত্র হরনের একটি অসুস্থ প্রবণতা তৈরি হতে থাকে এবং

> **"পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত পর থেকেই সিরাজ চরিত্র হণনের একটি অসুস্থ প্রবণতা তৈরী হতে থাকে এবং যুদ্ধে পরাজয়ের সকল দায় দায়িত্ব তাদের ওপর নিক্ষেপ করা হয়। এটা খুব সহজেই বোধগম্য যে, সিরাজের বিরোধীরাই পলাশী যুদ্ধ-পরবর্তী প্রায় দুই শতাব্দীকাল শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকেছে এবং পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে সিরাজ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত ও মূল্যায়নকে প্রভাবিত করেছে"**

যুদ্ধে পরাজয়ের সকল দায় দায়িত্ব তাদের ওপর নিক্ষেপ করা হয়। এটা খুব সহজেই বোধগম্য যে, সিরাজের বিরোধীরাই পলাশী যুদ্ধ পরবর্তী প্রায় দুই শতাব্দীকাল শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকেছে এবং পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে সিরাজ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত ও মূল্যায়নকে প্রভাবিত করেছে'৪। নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের অর্থ এ নয় যে, একজন শাসক গিয়েছে আর একজন শাসক এসেছে। এ উপমহাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি, আইন, শাসন, সামগ্রিক জীবনাচার, ধর্ম, কৃষ্টি, সভ্যতা, সামাজিকতা এবং অর্থনৈতিক জীবনে যে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়, তাতে সমাজের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারগুলি হয়ে যায় সবচেয়ে নিঃস্ব, দরিদ্র, নির্যাতিত অপরদিকে একদল তোষামুদে দালাল তৈরী হয়, যারা সমাজের দন্ডমুণ্ডের কর্তা বনে যায়। এই সামগ্রিক পরিবর্তনকে একজন নবাবের পতন হিসেবে দেখা মানে ইতিহাসের অবমূল্যায়ন করা, জাতিসত্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে বেখবর থাকা। মূলত বাংলার ক্ষমতা দখল এবং এখানকার সম্পদ লুণ্ঠনই ছিলো দখলদার ইংরেজদের মূল উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রধান বাধা ছিলো নবাব এবং সম্ভ্রান্ত তৎকালীন সমাজের মুসলিম পরিবারগুলো যারা কখনো ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করতে রাজি ছিলো না। এ জন্য তারা ষড়যন্ত্রের যে জাল বিস্তার করে তারই ধারাবাহিক ফল পলাশীর বিপর্যয়। পলাশীর প্রান্তরে ইস্ট কোম্পানী কোনোভাইে সফল হতো না যদি ষড়যন্ত্রকারীরা সৈন্যদেরকে যুদ্ধ হতে বিরত না রাখতো। ইস্ট কোম্পানী এবং নবাবের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৫০ হাজার, পদাতিক ৩৫ হাজার, অশ্বারোহী ১৫ হাজার মোট কামান ৫৩ টি। এর বিপরীতে রবার্ট ক্লাইভের সৈন্যসংখ্যা ছিল তিন হাজার। এর মধ্যে এ দেশীয় সিপাহী ২২০০ এবং ইউরোপীয়ান সৈন্য ৮০০। নবাবের এতো বিপুল সৈন্য সংখ্যা কিভাবে পরাজিত হয়? মূলত পলাশী প্রান্তরে কোনো যুদ্ধ হয়নি। ষড়যন্ত্রকারীরা সৈনিকদেরকে যুদ্ধ হতে বিরত রেখেছে এবং নবাবকে মৃত্যুর মূখে ঠেলে দিয়েছে। যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি মীর জাফর ও রায় দুর্লভের চক্রান্তে সৈন্যদের বিপুল সংখ্যক যুদ্ধ হতে বিরত থাকে। মীরমদন ও মোহন লাল স্বল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে প্রাণপন লড়াই করেও ইস্ট কোম্পানীকে পরাস্ত করতে পারেননি। ২৩ জুন বাংলার শেষ স্বাধীন সূর্য এখানেই অস্তমিত হয়। ৩০ জুন রাজমহলে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে গ্রেফতার করা হয়। ০২ জুলাই ১৭৫৭ তাঁকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় মুর্শিদাবাদে আনা হয়। রাতে মীর জাফর পুত্র মীরনের আদেশে ঘাতক মোহাম্মদী বেগ তাঁকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে।

পলাশী বিপর্যয়ের পেছনে ঘরের শত্রু বিভীষন যে ছিল প্রতিটি পদে পদে তা বোঝা যায় খুব সহজেই। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম দিকের কেরানী পরবর্তীতে লর্ড উপাধি পাওয়া লর্ড ক্লাইভ তাঁর নিজের ভাষায় বলেছেন, 'ইংরজেরা ঘরের টাকা খরচ করে যুদ্ধ করে ভিনদেশ দখল করেছে। কিন্তু ভারত দখল করতে ইংল্যান্ড হতে এক পয়সাও আনতে হয়নি। সমস্ত অর্থই পাওয়া গেছে ভারতে ৫। কোনো সমাজ এবং জনপদে যদি বিশ্বাস ভঙ্গকারী কোনো গোষ্ঠী তৈরী হয়। জাতির অভ্যন্তরে বেঈমানের জন্ম হয় তবে সে সমাজের অবস্থা এমন করুণ হয়ে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। বিশ্বাস এবং আদর্শের যায়গায় তাই যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি দরকার তা হচ্ছে আদর্শের প্রতি দৃঢ় আস্থা, নিজ ঈমান এবং বিবেকের দায়বদ্ধতা। যে বিষয়টির অভাবে একটি রাষ্ট্র ও সমাজ ভেঙে যাওয়া স্বাভাবিক। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম সেরা ইসলামী চিন্তানায়ক মাওলানা মওদূদী তার এক ভাষণে উল্লেখ করে বলেন, এই যে, ইংরেজরা দু'শ বছর এ উপমহাদেশ শাসন করলো। তাদের কোতয়াল, তাদের সেনাবাহিনী, তাদের পুলিশ এ দেশের জনগণের মধ্য হতেই সরবরাহ করা হয়েছে। মুসলমানের সন্তান হয়ে আরেক মুসলমানের গলা কেটেছে ইংরেজের অনুগত সেবাদাস কর্মচারী হওয়ার কারণে। এই উপমহাদেশ হতেই তারা তাদের সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে ৫। যুগ ও সময়ের বিবর্তনে আমরা যেন আর একটি পলাশীর সামনে দণ্ডায়মান। এমনি সময়ে নতুন করে শপথ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। বাংলার পতনের রাজনৈতিক কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ইতিহাসবিদ আব্বাস আলী খান লিখেছেন 'ধবংসের বীজ বহু আগেই রোপন করা হয়েছিলো বাদশাহ আকবর কর্তৃক। যা ধীরে ধীরে বিশাল মহীরুহ আকার ধারণ করেছিলো।.... কোনো এক চরম অশুভ শক্তি শুধুমাত্র মুসলমানদের তৌহিদী আকীদা বিশ্বাস ও ইসলামী তামাদ্দুন ধ্বংস করার জন্য আকবরের প্রতিভাকে ব্যবহার করেছে, তা বিবেকসম্পন্ন মানুষ মাত্রই বুঝতে পারেন। কিন্তু আকবর তাঁর নিজের স্বপ্নসাধ পূরণ করতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন।৬

দেশপ্রেমিক সিরাজ এবং তার বিপরীতে একদল বিশ্বাসঘাতকের শ্রেণিচরিত্র বিশ্লেষণ করে ইতিহাসের শিক্ষাকে ধারণ করে আজ বজ্র সাহসে বলীয়ান হওয়া দেশপ্রেমিক প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য। আমরা আমাদের চতুর্দিকে হায়েনার গোঙানি শুনতে পাই। রক্তচোষা ড্রাকুলারা আমাদের মানচিত্রে দন্তনখর বসাতে সদা অপতৎপরতা চালাতে নানান ছুতোয় বন্ধু সেজে হাজির হয়। সময় বয়ে চলে প্রতিদিন নতুন সূর্য উদিত হয়। প্রতিটি নতুন প্রভাতের আলোকচ্ছটায় নতুন সূযের রূপ রঙ একই থাকে। সবুজ বন বীথি আর নদীর ছলাৎ ছলাৎ বয়ে চলার শব্দে কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় না। একইভাবে মীর জাফরেরাও যুগে যুগে নানান আবয়বে হাজির হলেও তাদের উদ্দেশ্য এবং শ্রেণি চরিত্র একই থাকে। সময়ের নির্মম বাস্তবতায় আমরা আরও একটি পলাশীর দাড়প্রান্তে। শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করে বিশ্বাস এবং আদর্শের ভিত্তিতে এক দূর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর রচনা সময়ের অনিবার্য দাবী।

তথ্যসূত্র:

১. ড. কে এম মোহসিন ,পলাশীর যুদ্ধ

২. প্রফেসর এম এ রহীম, নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, 'আর কেনো পলাশী নয়' স্মারকগ্রন্থ-১৯৯৭

৩. Mohor Ali, The History of Muslim of Bengal-১৯৮৫, অনুবাদ-সালেহ মাহমুদ রিয়াদ

৪. আজকের দুনিয়ায় ইসলাম,সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, অনুবাদ-মুনির উদ্দিন আহমদ

৫. পলাশী চক্রান্তের নেপথ্যে, এরশাদ মজুমদার।

৬. আব্বাস আলী খান, বাংলার পতনের রাজনৈতিক কারণ, 'বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস'

লেখক: সাধারণ সম্পাদক,
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে শ্রমজীবী ভাই-বোনদের প্রতি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের আহবান

প্রিয় শ্রমজীবী ভাই ও বোনেরা

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

১মে মহান 'মে দিবস' বা "আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস"। বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের কাছে এ দিনটি যেমন খুবই তাৎপর্যময় তেমনি অনেক বেশী আবেগ ও প্রেরণার। আজ থেকে ১৩৬ বছর আগে ১৮৮৬ সালের ৪মে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটের সামনে শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে সূচিত হয় শ্রমজীবী মানুষের বিজয়ের ধারা। সেই ধারাবাহিকতায় শ্রমজীবী মানুষ তাদের কাজের প্রাথমিক স্বীকৃতি পেয়েছে। ১মে এক দিনের আন্দোলনের ফসল নয় বরং দীর্ঘ সময় ধরে দাবী আদায়ের আন্দোলন সংগ্রামে কিছুটা প্রাপ্তি এবং স্বীকৃতি অর্জিত হয়েছে। শ্রমিকদের দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে শেষ পর্যন্ত দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজ করার দাবী অফিসিয়াল স্বীকৃতি পায়। ১৮৮৯ সালে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে শ্রমিক নেতাদের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ১মে "আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস" হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের এ গৌরবময় অধ্যায়কে স্মরণ করে ১৮৯০ সাল থেকে প্রতি বছর ১মে বিশ্বব্যাপী পালন হয়ে আসছে 'মে দিবস' বা "আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস"। তাই ঐতিহাসিক 'মে দিবস' বা "আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস" শ্রমিকের মর্যাদা রক্ষার দিন। তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দিন। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল দেশ এবং আইএলও কর্তৃক প্রণীত নীতিমালায় স্বাক্ষরকারী দেশ। এ দেশে শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা প্রায় সাড়ে সাত কোটি। শ্রমিক দিবসের প্রেরণা থেকে বাংলাদেশ মোটেও পিছিয়ে নেই। রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও শ্রমিক সংগঠনগুলো বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে আনন্দঘন পরিবেশে দিবসটি উদযাপন করে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন "আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস ২০২২" যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষে দশ দিনব্যাপী (২৮ এপ্রিল-৭ মে) বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করতে যাচ্ছে।

অধিকার হারা শ্রমজীবী ভাই ও বোনেরা

প্রতি বছর 'মে দিবস' উদযাপনের মধ্য দিয়ে শ্রমিকরা একদিকে যেমন তাদের অধিকার আদায়ের রক্তাক্ত ইতিহাসকে স্মরণ করে তেমনি ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মাধ্যমে তাদের অধিকার আদায়ের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। আত্মত্যাগকারী শ্রমিকদের স্বপ্ন ছিল শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য অধিকার ফিরে পাবে এবং সামাজিক মর্যাদা ও আত্মসম্মানের সাথে পরিবার পরিজন নিয়ে বেঁচে থাকবে। কিন্তু আজও শ্রমিকদের সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয়নি। বাংলাদেশের শ্রমিকদের দিকে তাকালে আমরা আজও দেখতে পাই মালিক শ্রেণীর শোষণ, বঞ্চনা ও নির্যাতন-নিস্পেষণের বলি হয়ে অসহায়-মেহনতি শ্রমিকদেরকে প্রাণ দিতে হচ্ছে। ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল সাভারের রানা প্লাজা ধসের ঘটনায় বার শতাধিক নিরীহ শ্রমিকের করুণ মৃত্যু, হাজার হাজার শ্রমিক আহত ও পঙ্গুত্ব বরণের লোমহর্ষক দৃশ্য পুরো বিশ্ববাসীকে শোকাহত করে। ২০১২ সালে আশুলিয়ায় তাজরীন ফ্যাশনস লিমিটেডের গার্মেন্টস কারখানায় আগুন লেগে ১১১ জন শ্রমিকের পুড়ে মরা এবং শত শত শ্রমিক আহত হওয়া, ২০১০ সালে হামিম গার্মেন্টসসহ তিনটি গার্মেন্টস কারখানায় শ্রমিকের প্রাণ হারানোরমত অসংখ্য দুর্ঘটনার প্রধান কারণ হচ্ছে মালিক শ্রেণীর গাফলতি। এসব দুর্ঘটনায় যেসব শ্রমিক মারা যায় বা পঙ্গুত্ব বরণ করে তাদের পরিবারের রুটি-রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাদেরকে মানবেতর জীবন যাপন করতে হয়। আজকের এই উচ্চ দ্রব্যমূল্যের বাজারে শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য মজুরি পাচ্ছে না। যেখানে শ্রমিক আন্দোলন হয়েছিল ৮ ঘন্টা কর্ম দিবসের জন্য। সেখানে বাংলাদেশের মিল-কারখানা ও গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলোতে এখনও ৮ ঘন্টার পরিবর্তে ১২ ঘন্টা কাজ করানো হচ্ছে। আজকে শ্রমিকদের কোনো নিরাপত্তা নেই। শ্রমিকেরা মৃত্যুর ঝুঁকি মাথায় নিয়ে পেটের দায়ে কাজ করে যাচ্ছে। মালিকপক্ষ শ্রমিকদের বেতন বকেয়া রেখে উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে চায় বিধায় মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় দ্বন্দ্ব-সংঘাত দেখা যায়। আমাদের দেশে শ্রমিকদের বড় একটি অংশ নারী ও শিশু। নারী শ্রমিকদের প্রসূতিকালীন ছুটি ও শিশু যত্নাগারসহ নানা সুবিধার কথা শ্রম আইনে থাকলেও অধিকাংশ মালিক তা দিতে চায় না। ফলে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ করেও তারা মানবেতর জীবনযাপন করছে। আবার অনেকের জীবন ঝুঁকির মধ্যেও পড়ে যাচ্ছে। মারাও যাচ্ছে অনেক শ্রমিক। বাংলাদেশের শিশুরা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করার কারণে শারীরিক ও মানসিকভাবে বেড়ে উঠতে পারছে না। শিক্ষাসহ বিভিন্ন সামাজিক সুযোগ-সুবিধা থেকে তারা হচ্ছে বঞ্চিত। এসব শিশু স্নেহ-ভালোবাসার অভাবে এক সময় অপরাধ জগতে পা বাড়ায়।

সংগ্রামী শ্রমজীবী ভাই ও বোনেরা

একজন মানুষের জীবনধারণের জন্য মৌলিক প্রয়োজন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা। এসব একজন শ্রমিকের প্রাপ্য অধিকার। আর এটাই হচ্ছে শ্রমিকের প্রকৃত মর্যাদা। একুশ শতকে এসে শ্রমিকরা কতটুকু মর্যাদা বা অধিকার ভোগ করছে? বর্তমান রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে শ্রমিকদের স্বার্থ নিয়ে অবশ্যই ভাবতে হবে। কারণ শ্রমিকরা এ দেশের সম্পদ। তারাই দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রেখেছে। শ্রমিকদেরকে অবহেলার চোখে দেখার কোনো সুযোগ নেই। তাদের সামাজিক মর্যাদা ও জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। মহান মে দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে এর কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় হচ্ছে আমরা শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য অধিকারের কথা বলি কিন্তু বাস্তবে শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে শাসক ও মালিক পক্ষ আদৌ আন্তরিক হতে পারেনি। যদিও যান্ত্রিক বিপ্লবের কারণে শ্রমজীবী মানুষের কাজের পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু পরিবর্তন আসেনি শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে। তাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার অধিকার অদ্যাবধি অধরাই থেকে গেল। শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠার রক্তাক্ত ইতিহাসের মধ্য দিয়ে শ্রমিকরা তাদের কিছু অধিকার অর্জন করলেও সকল দিক থকে শ্রমিকরা তাদের অধিকার পুরোপুরি

অর্জন করতে পারেনি। মে দিবস ঘটা করে পালন হলেও শ্রমিকরা আজও অবহেলা-অবজ্ঞা, নির্যাতন, নিপীড়ন ও বঞ্চনার শিকার।

সম্মানিত শ্রমজীবী ভাই ও বোনেরা

আধুনিক বিশ্বের পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা শ্রমিকের প্রকৃত অধিকার ও মর্যাদা বুঝিয়ে দিতে পারেনি। তথাকথিত শ্রমিকনেতারা মুখেমুখে শ্রমিক অধিকারের কথা বললেও বাস্তবে শ্রমিকদের পুঁজি করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল ও ব্যক্তিগত অর্থ বৈভবের মালিক হয়েছে। ফলশ্রুতিতে মেহনতি শ্রমিকরা প্রতিনিয়ত নিষ্পেষিত হচ্ছে। ভ্রান্ত এই শ্রমনীতি মালিক ও শ্রমিককে শত্রুতে পরিণত করেছে। শ্রমিকের অধিকার, কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ, সঠিক কর্মঘন্টা ও সর্বোপরি ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রদানের দাবী আজও বাস্তবায়িত হয়নি। অন্যদিকে ইসলামী শ্রম-নীতিতে শ্রমজীবী মানুষের সঠিক মর্যাদা ও অধিকার সু-স্পষ্টভাবে দেওয়া হয়েছে। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.) তার জীবদ্দশায় দুনিয়াবাসীর সামনে এক চির শাশ্বত অনুপম শ্রমনীতি উপস্থাপন ও বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে শ্রমিকের অধিকার সম্পর্কে প্রিয় নবী (সা.) বলেছেন, “শ্রমিকের শরীরের ঘাম শুকানোর পূর্বে তাদের প্রাপ্য মজুরি দিয়ে দাও।” তিনি অন্যত্র বলেছেন, “শ্রমিককে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ দিবেনা, দিলে তাকে সে কাজে সহযোগিতা করো।” শ্রমিক ও মালিক দু’জনেই সমান মর্যাদার অধিকারী। তাই তিনি আরো বলেছেন, “আল্লাহ তায়ালা যে ভাইকে তোমার অধীন করে দিয়েছেন তাকে তা-ই খেতে দাও, যা তুমি খাও। তাকে তা-ই পরিধান করতে দাও, যা তুমি পরিধান করো।” শ্রমজীবী মানুষের প্রতি এই ইনসাফপূর্ণ নীতি শুধু সেই সময়ের জন্য নয় বরং কেয়ামত পর্যন্ত এক অনুকরণীয় আদর্শ। যে অধিকারের জন্য শ্রমিকেরা শিকাগোর রাজপথে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছিল সেই অধিকার থেকে আজও তারা বঞ্চিত। ইসলামী শ্রমনীতি কেবল এই অসহায় মেহেনতি মানুষের মুক্তি দিতে পারে। পৃথিবীর সভ্যতা সচল রাখতে শ্রম অবধারিত। ঠিক তেমনিভাবে এই শ্রমের প্রকৃত মূল্যায়ন কেবল ইসলাম প্রদত্ত শ্রমনীতিতে রয়েছে। সুতরাং মালিক শ্রমিক সম্পর্ক সেদিনই সু-সম্পর্কে রূপ নিবে যখন ইসলামী শ্রমনী-তি বাস্তবায়ন হবে। আর এই সু-সম্পর্কের বদৌলতে আমাদের দেশের উৎপাদনশীলতা যেমনি বৃদ্ধি পাবে ঠিক তেমনি প্রত্যেক শ্রমিক তার ন্যায্য অধিকার ফিরে পাওয়ার সাথে সাথে একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও অনাবিল জীবনের নিশ্চয়তা পাবে। তাই ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের নিমিত্তে রাষ্ট্রক্ষমতায় সৎ, যোগ্য ও ন্যায়পরায়ণ লোকদের আনয়নের আন্দোলনে আমাদের জোর প্রচেষ্টা চালানো সময়ের দাবী।

আসুন ২০২২ সালের আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করি এবং বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলি-

১. ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে দেশের শ্রমনীতি ঢেলে সাজাতে হবে।
২. বন্ধকৃত পাটকলসহ সকল বন্ধ কল-কারখানা অবিলম্বে চালু করতে হবে।
৩. শ্রমিক-কর্মচারীদের বকেয়া বেতন অবিলম্বে পরিশোধ করতে হবে।
৪. জাতীয়ভাবে ন্যূনতম মজুরি কাঠামো নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
৫. গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২০ হাজার টাকা চালু করতে হবে।
৬. দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ করতে হবে এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম শ্রমজীবী মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।
৭. ছাটাইকৃত গার্মেন্টস শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণসহ পূনঃ নিয়োগ দিতে হবে।
৮. শ্রমজীবী মানুষের জন্য বাসস্থান, রেশনিং, চিকিৎসা ও তাদের সন্তানদের বিনামূল্যে শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
৯. কল-কারখানায় ঝুঁকিমুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ ও অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
১০. নারী শ্রমিকদের প্রসূতিকালীন ছুটি ও ভাতা প্রদানসহ সন্তানদের জন্য শিশু যত্নাগার স্থাপন করতে হবে।
১১. নারী ও পুরুষের বেতন-ভাতার সমতা বিধান করার পাশাপাশি কল-কারখানায় নারী শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।
১২. কর্মস্থলে আহত ও নিহত শ্রমিকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরন নিশ্চিত করতে হবে।
১৩. পরিবহন সেক্টরে চাঁদাবাজি বন্ধসহ পরিবহন শ্রমিকদের নিয়োগপত্র প্রদান এবং সরকারিভাবে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।
১৪. সার, বীজ, কীটনাশকসহ কৃষি উপকরণের মূল্য কমানো এবং উৎপাদিত কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে হবে।
১৫. শ্রমিকদের ন্যায় বিচার ত্বরান্বিত করার স্বার্থে শ্রমঘন এলাকায় শ্রম আদালত প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
১৬. শ্রমিকদের পেশাগত ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। ১৭. শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মুনাফায় শ্রমিকদের অংশ প্রদান করতে হবে।
১৮. ঢাকাসহ বিভাগীয় শহর সমূহে রিক্শা চলাচলের জন্য আলাদা লেনের ব্যবস্থা করতে হবে।
১৯. হকারদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে হলি-ডে মার্কেট চালু করতে হবে।
২০. আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ এর পূর্ণ বাস্তবায়ন করে সকল পেশায় অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

সম্মানিত শ্রমিক ভাই ও বোনেরা

ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ১৯৬৮ সালের ২৩ মে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ‘বা. জা.ফে-০৮’। এই ফেডারেশন অর্ধ শতাব্দীর বেশী সময় ধরে এ দেশে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার নিয়ে কাজ করছে। বহু চড়াই উতরাই পেরিয়ে ফেডারেশন আজও হাটি-হাটি পা-পা করে ইসলামী শ্রমনীতির পতাকা বুকে ধারণ করে এগিয়ে যাচ্ছে। মূলত শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন শ্রমিক ময়দানে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায় যেখানে শ্রমিক মালিক সবার অধিকার সংরক্ষিত থাকবে এবং চাওয়ার আগে প্রত্যেকের অধিকার আদায় করে দিতে সবাই সচেষ্ট থাকবে। এতে উভয়ের মধ্যে সু-সম্পর্ক বিরাজ করবে। কাজেই শ্রমিক-মালিক উভয় পক্ষ যদি ইসলাম প্রদর্শিত নীতিমালা অনুসরণ করে; তাহলে একদিকে শ্রমিকদেরকে দাবী আদায়ের জন্য আন্দোলন করতে হবে না অন্যদিকে মালিকরা শ্রমিকদের শোষণ করার মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসবে। এজন্য শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সম্মিলিতভাবে ইসলামী শ্রমনীতি অনুসরণের বিকল্প নেই।

আসুন, শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে আমরা ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শামিল হই এবং মেহনতি মানুষের আর্তনাদ ও আর্তচিৎকার বন্ধ করে তাদের মুখে হাসি ফোটাই। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

ফেডারেশন সংবাদ

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

স্বাধীনতার সুফল পেতে হলে বৈষম্য মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে : গোলাম রব্বানী

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রব্বানী বলেছেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পেছনে একটি উজ্জ্বল পটভূমি রয়েছে। দেশের মানুষ শোষণ বঞ্চনাহীন একটি সোনার দেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। দুঃখজনক হলেও সত্য স্বাধীনতার অর্ধশত বছর পরেও জনগণ তার কাঙ্ক্ষিত মুক্তি পায়নি। বরং পদে পদে দেশের আপামর মুক্তিকামী জনতার হাতে পরানো হয়েছে শ্রেণি শৃঙ্খলের বেড়ি। শ্রেণি শৃঙ্খল মানুষে মানুষে বিভেদ ও বৈষম্য তৈরি করেছে। স্বাধীনতার সুফল পেতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই এই শ্রেণি শৃঙ্খলের পথ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। বৈষম্য মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

তিনি গত ২৫ মার্চ শুক্রবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী উত্তর কর্তৃক আয়োজিত মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। মহানগরী সভাপতি মো. মহিব্বুল্লাহর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমানের সঞ্চালনায় এতে আরও বক্তব্য রাখেন তুরাগ মধ্য থানা সভাপতি বশির আহমদ, তুরাগ দক্ষিণ থানা সভাপতি আবু হানিফ ও উত্তরখান থানা সভাপতি ইফতেখার মো. আকন প্রমুখ।

গোলাম রব্বানী বলেন, স্বাধীনতার সুফল পেতে হলে মানুষে মানুষে বিভেদ নয় বরং হাতে হাত রাখতে হবে। রাজনৈতিক মতাদর্শ, ব্যক্তিগত স্বার্থ ভুলে দেশের স্বার্থে কাজ করতে হবে। শ্রমজীবীসহ সকল মানুষের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। গণতান্ত্রিক ধারা বজায় রাখতে সকল দল মতের মানুষদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। একটি সুস্থির গণতান্ত্রিক দেশ কেবল মাত্র সামনের পথে অগ্রসর হতে পারে। গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ ছাড়া রাষ্ট্র ও সমাজ তার কাঙ্খিত গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে না।

তিনি আরও বলেন, সকল মানুষের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে সকল ধরনের শ্রেণি পথা বাদ দিতে হবে। যারা শ্রম বিনিয়োগ করবেন তাদের শ্রমের ন্যায্য মজুরি দিতে হবে।

গোলাম রব্বানী চলমান দ্রব্যমূল্যের হ্রাস টেনে ধরতে সরকারের কাছে আহবান জানান। একই সাথে তিনি বলেন, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে শ্রমজীবী মানুষদের অবর্ণনীয় দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি শ্রমিকদের নিঃশেষ করে দিচ্ছে। তাই বিলম্ব না করে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণের জন্য পদক্ষেপ নিতে সরকারের কাছে আমি জোর দাবি জানাচ্ছি।

২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস

উদযাপন উপলক্ষ্যে
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঘোষিত

দেশব্যাপী কর্মসূচি পালন

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত র‍্যালি পরবর্তি সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক নুরুল আমিন। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন মহানগরী দক্ষিণের সহ-সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান মাসুম,সহ-সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা মিঠু, দফতর সম্পাদক মাহবুবুর রহমান। এছাড়াও মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে রাজধানীর যাত্রাবাড়ি এলাকায় শ্রমিকদের মাঝে খাবার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

চট্টগ্রাম মহানগরী

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে চট্টগ্রাম মহানগরীর উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুর্ষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমানের সঞ্চালনায় উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের মহানগরী সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খান। এসময় আরও বক্তব্য রাখেন মহানগরীর সহ-সাধারন সম্পাদক কামাল উদ্দিন আহমদ, হোটেল শ্রমিক নেতা মুহাম্মদ নুরুন্নবী, সিএনজি শ্রমিক নেতা কামাল উদ্দিনসহ শ্রমিক নেতৃবৃন্দ। এছাড়াও মহানগরীর পাঁচলাইশ থানার উদ্যোগে ফ্রি চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম-অনুষ্ঠিত হয়। চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম উদ্বোধন করেন পাচঁলাইশ থানা সভাপতি ডাক্তার আমির হোসাইন।

খুলনা মাহানগরী

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে খুলনা মহানগরীর উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। খুলনা মহানগরীর সভাপতি আজিজুল ইসলাম ফরাজীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমানের পরিচালনায় উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরীর উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট শাহ আলম। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা খলিলুর রহমান,

দবির উদ্দিন মোল্লা, আবুল হোসেন, আব্দুস সাত্তার, কামরুল ইসলাম, মেহেদি হাসান প্রমুখ। এছাড়াও মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনাল এলাকায় শিশু শ্রমিকদের মাঝে খাবার বিতরণ এবং আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে শ্রমিকদের মাঝে নগদ অর্থ প্রদান করা হয়।

সিলেট মহানগরী

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে সিলেট মহানগরের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের মহানগরী সভাপতি অ্যাডভোকেট জামিল আহমদ রাজু-এর সভাপতিত্বে ও সহ-সাধারণ সম্পাদক কফিলউদ্দীন আলমগীর-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সোহেল আহমাদ। আলোচনা সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের মহানগর দফতর সম্পাদক দিলশাদ মিয়া, কোতোয়ালী পশ্চিম থানা সভাপতি গোলামুর রহমান, হাসপাতাল সেক্টরের সভাপতি আল মুমিন, শ্রমিক নেতা মাওলানা আসাদুজ্জামান, আব্দুস সাত্তার মুন্না, আকবার আলী, নাজমুল ইসলাম, আবু কাওছার, আবু বকর সিদ্দিক, সাইদুল ইসলাম ও বদরুজ্জামান প্রমুখ ।

কুমিল্লা মহানগরী

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে কুমিল্লা মহানগরীর কুমিল্লা আদর্শ সদর স্থল বন্দর লোড আনলোড শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কুমিল্লা মহানগরী সভাপতি কাজী নজির আহমদ।

গাজীপুর মহানগরী

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে গাজীপুর মহানগরের মেট্রো মধ্য থানার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোআ অনুষ্ঠিত হয়। থানা সভাপতি মিনারুল ইসলাম মাহাদির সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের মহানগর সভাপতি মো. মুহিউদ্দিন। এছাড়াও গাছা থানার উদ্যোগে আলোচনা সভা, সদর পশ্চিম ও শ্রীপুর পৌরসভার যৌথ উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ক্রিকেট খেলার আয়োজন করা হয়।

টাঙ্গাইল জেলা

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে টাঙ্গাইল জেলার বাসাইল থানার উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাসাইল থানা সভাপতি আব্দুল কারিম আকন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের টাঙ্গাইল জেলা সভাপতি অধ্যাপক শফিকুল ইসলাম খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাসাইল থানার উপদেষ্টা আফজাল হোসেন, সহিদুর রহমান। এসময় স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বগুড়া শহর

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে বগুড়া শহর শাখার উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শহর শাখার সভাপতি আজগর আলীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলামের পরিচালনায় উক্ত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন শহর শাখার সহ-সভাপতি ও কাউন্সিলর এরশাদুল বারী, লুৎফর রহমান, সহ-সাধারণ সম্পাদক মুখলেসুর রহমান, আব্দুল কাদের রানা, মোরশেদুল ইসলাম সুইট, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস, সাংস্কৃতিক সম্পাদক শাহদাদ হোসেন, কর্মসংস্থান সম্পাদক মাহবুবুর রহমান প্রমুখ।

চাঁদপুর জেলা

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি পৌরসভার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও শ্রমিকদের মাঝে খাদ্য বিতরণের আয়োজন করা হয়। ফেডারেশনের শাহরাস্তি পৌরসভা সভাপতি শেখ মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা হেদায়েত উল্লাহর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের উপদেষ্টা ও শাহরাস্তি উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাওলানা আবুল হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা গোলাম ফারুক ইয়াইয়া। আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের শাহরাস্তি উপজেলার সাবেক সভাপতি ডাক্তার আবুল বাশার।

পটুয়াখালী জেলা

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে পটুয়াখালী জেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের পটুয়াখালী জেলা সভাপতি সাইদুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আল মামুনের পরিচালনায় উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক শাহ আলম।

মানিকগঞ্জ জেলা

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে মানিকগঞ্জ জেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের মানিকগঞ্জ জেলা সভাপতি মোহাম্মাদ আবু তাহেরের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আওলাদ হোসেনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও ঢাকা অঞ্চল উত্তরের পরিচালক মনসুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা কামরুল ইসলাম।

নোয়াখালী জেলা

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার উদ্যোগে শ্রমিক পরিবারের সন্তানদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়। ফেডারেশনের উপজেলা সভাপতি এবিএম হেলাল উদ্দীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত খাদ্য বিতরণ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি অ্যাডভোকেট জহিরুল আলম। বিশেষ অতিথি উপজেলার উপদেষ্টা অধ্যক্ষ বেলায়েত হোসেন।

সুনামগঞ্জ জেলা

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনিয়নের সভাপতি মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক কায়েছ আহমেদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সিলেট দক্ষিণ জেলা সভাপতি ফখরুল ইসলাম খান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য

রাখেন ফেডারেশনের সুনামগঞ্জ জেলা সভাপতি শাহ আলম, জেলা সহ-সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রিয়াজুল ইসলাম তালেব, জেলা কোষাধ্যক্ষ ওয়াসিদ আলী। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা জাবেদ আহমদ, নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন এর সিংচাপইড় ইউনিয়নের সভাপতি আকবর হোসেন, দক্ষিণ সুরমা ইউনিয়ন সভাপতি মস্তাব আলী, সৈয়দের গাঁও ইউনিয়ন সভাপতি আয়াজুর রহমান, চর মহল্লা ইউনিয়ন সভাপতি রাজু আহমদ, আফজালাবাদ ইউনিয়ন সভাপতি আব্দুল মতিন প্রমুখ।

সিলেট জেলা দক্ষিণ

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে সিলেট দক্ষিণ জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলা ফার্নিচার শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়নের সভাপতি মাজাহারুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সিলেট দক্ষিণ জেলা সভাপতি ফখরুল ইসলাম খান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের জেলা সহ-সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আব্দুল হান্নান, গোলাপগঞ্জ পৌরসভা সভাপতি ও সাবেক কাউন্সিলর গোলাম মস্তফা মুসা, শ্রমিক নেতা উমর ফারুক।

লক্ষ্মীপুর জেলা

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন লক্ষ্মীপুর শহর শাখার উদ্যোগে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ফেডারেশনের লক্ষ্মীপুর শহর সভাপতি মঞ্জুরুল আলমের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক শরীফুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের লক্ষ্মীপুর জেলা সভাপতি মমিন উল্যাহ পাটোয়ারী। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের লক্ষ্মীপুর শহর শাখার উপদেষ্টা ও সাবেক শহর সভাপতি উপাধ্যক্ষ হারুনুর রশিদ, শহর শাখার উপদেষ্টা ও সদর উপজেলা দর্জি ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি নাসির উদ্দিন। উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা নওশের আলী, নুর আলম আজাদ, নুর ইসলাম সুমন, মহিন উদ্দিন প্রমুখ।

কক্সবাজার জেলা

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে কক্সবাজার শহর শাখার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোআ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের শহর সভাপতি আমিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ শাহজাহানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কক্সবাজার জেলা সভাপতি শামসুল আলম বাহাদুর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শহর শাখার উপদেষ্টা মুহাম্মাদ শাকিল, জেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ মহসিন। এসময় উপস্থিত ছিলেন শহর শাখার সহ-সভাপতি এম ইউ বাহাদুর, কামাল উদ্দিন, সহ-সাধারণ সম্পাদক আমীর আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আলম মাসুদ প্রমুখ।

ময়মনসিংহ জেলা

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে ময়মনসিংহ জেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোআ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের জেলা সভপতি মাহবুবুর রশিদ ফরাজীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রগতিশীল গার্মেন্টস ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কামরুন্নাহার, ফেডারেশনের ভালুকা উপজেলা সভাপতি জহির উদ্দিন ইয়ামিন, ভালুকা উপজেলা সাবেক সভাপতি রুহুল আমিন, গার্মেন্টস সেক্টরের সভাপতি ফজলুল হক।

ঢাকা জেলা উত্তর

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা জেলা উত্তরের আশুলিয়া থানার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোআ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের থানা সভাপতি ফজলুক হকের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মনসুর রহমান।

হবিগঞ্জ জেলা

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলার উদ্যোগে হামদ, নাত, ক্বেরাত ও সাধারণ জ্ঞানের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

জামালপুর জেলা

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে জামালপুর জেলার সদর উপজেলার ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোআ অনুষ্ঠিত হয়।

ফরিদপুর জেলা

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে ফরিদপুর জেলার ইলেকট্রিক মিস্ত্রী শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়নের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোআ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়ন সভাপতি শামসুদ্দিন মুহাম্মদ ইলিয়াসের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম মুন্না-এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম।

গাজীপুর জেলা

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে গাজীপুর জেলার সদর ও শ্রীপুর পৌরসভার উদ্যোগে শ্রমিকদের নিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের শ্রীপুর পৌরসভা সভাপতি কামাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষিজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হাসান রাজু। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম।

পঞ্চগড় জেলা

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে পঞ্চগড় জেলার আটোয়ারী উপজেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের জন্য অটো ভ্যান বিতরণ করা হয়। আটোয়ারী উপজেলা সভাপতি ও বলরামপুর ইউনিয়নের ইউপি সদস্য মোঃ সাদ্দাম হোসেনের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মোঃ ওয়ালিউর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সাধারণ সম্পাদক ও কাজলদিঘী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ তোফায়েল প্রধান।

বরিশাল জেলা পূর্ব

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে বরিশাল পূর্ব জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পৌরসভা সভাপতি নূরে রাব্বি নাঈমের সঞ্চালনায় ও উপজেলা সভাপতি মাওলানা সাইফুল

ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি শ্রমিক নেতা অ্যাডভোকেট জহির উদ্দিন ইয়ামিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা উপদেষ্টা মাওলানা ইব্রাহীম।

নারায়ণগঞ্জ জেলা

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ জেলার ফতুল্লা উত্তর থানার উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফতুল্লা উত্তর থানার সভাপতি রেদওয়ানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আলমগীর হুসাইন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সহ-সভাপতি আব্দুল মজিদ শিকদার।

রাজশাহী জেলা পূর্ব

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে রাজশাহী জেলা পূর্বের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের জেলা সভাপতি শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুনের পরিচালনায় আলোচনা সভা ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও রাজশাহী মহানগরী সভাপতি আব্দুস সামাদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের চারঘাট উপজেলা প্রধান উপদেষ্টা আবুল কালাম আজাদ। এসময় ফেডারেশনের চারঘাট উপজেলা সভাপতি হাফেজ রওশন আলমসহ স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিবৃতি

দ্রব্যমূল্যের চলমান ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে সরকারের প্রতি শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের আহ্বান

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে শ্রমজীবী মানুষদের অবর্ণনীয় দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে : শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান গত ৩ মার্চ বৃহস্পতিবার এক যৌথ বিবৃতিতে বলেছেন, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম প্রতিনিয়ত হু হু করে বেড়েই চলছে। করোনার এই মহামারীর সময় শ্রমজীবী মানুষরা কর্ম হারিয়ে দিশাহীন হয়ে পড়েছে। করোনার এই সময় বিশ্ববাজারে দ্রব্যমূল্যের দাম যতটা বৃদ্ধি পেয়েছে তার থেকে কয়েকগুণ বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে আমাদের দেশে। সরকারের ছত্রছায়ায় একটি কুচক্রী মহল শ্রমজীবীসহ সাধারণ জনগণকে জিম্মি করে তাদের আখের গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। বাজারে পর্যাপ্ত যোগান থাকা সত্ত্বেও অসাধু ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেটের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্যের দাম স্বাভাবিকের তুলনায় কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে। ফলে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে শ্রমজীবী মানুষদের অবর্ণনীয় দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। চলমান ঊর্ধ্বগতিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষদের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, আমাদের দেশে দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ শ্রমিক। তাদের যা উপার্জন তা দিয়ে করোনা মহামারীর পূর্বে সংসার চালানো মুশকিল ছিল। করোনার এই সময় প্রতিটি শ্রমিকের আয় কমে গেছে ২০-৩০ শতাংশ পর্যন্ত। ঠিক এই সময় এসে জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা শ্রমিকদের জন্য উদ্বেগজনক। নিম্ন আয়ের ও দিনে এনে দিন খাওয়া শ্রমিকদের আয়ের পুরো অংশ চলে যাচ্ছে ন্যূনতম খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করতে। বাসা ভাড়া, স্বাস্থ্য চিকিৎসা খাতে ব্যয় করার মত অবশিষ্ট অর্থ তাদের থাকছে না। চাল, ডাল ও তেল হতে শুরু করে এমন কোন দ্রব্য আজ বাজারে পাওয়া যাবে না যার দাম বৃদ্ধি পায়নি। এই ঊর্ধ্বগতি শ্রমিকদের নিঃশেষ করে দিচ্ছে। জিনিসপত্রের এই অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিতে শ্রমজীবীসহ সাধারণ মানুষদের জীবনে চরম দুর্ভোগ নেমে এসেছে। এখন প্রতিদিনের পত্রিকার পাতায় দেখা যাচ্ছে নিম্ন আয়ের মানুষের পাশাপাশি সমাজের মধ্যবিত্ত মানুষরা টিসিবির পণ্যের জন্য ভোর থেকে লাইনে দাঁড়াচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, চলমান ঊর্ধ্বগতি দেশের মানুষের জীবনে নাভিশ্বাস উঠে গেলেও সরকারের টনক নড়ছে না। সরকারের দায়িত্বশীল মন্ত্রীরা বাজার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা না করে অযাচিত কথা বলে মানুষের ক্ষোভ বাড়িয়ে দিচ্ছে। সরকারের মন্ত্রীদের অদ্ভুত সব যুক্তিতে অতি মুনাফালোভী ব্যবসায়ীরা আশকারা পেয়ে যাচ্ছে। অসাধু ব্যবসায়ীরা নিত্যপণ্য অবৈধভাবে মজুদ করে দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে। ফলে বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি হচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে কালোবাজারী ও অবৈধ সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কোন উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। অবিলম্বে বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম দেশের সকল বাজারে একই মূল্য করার উদ্যোগ নিতে হবে। যারা অবৈধভাবে নিত্যপণ্য মজুদ করে বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করেছে তাদেরকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, আজ প্রতিটি খেটে খাওয়া মানুষের ঘরে বোবা কান্না চলছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধির কারণে ক্ষোভে ফুঁসছে নিম্ন আয়ের থেকে মধ্যবিত্ত মানুষরা। এখনই দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির লাগাম টেনে ধরতে না পারলে অচিরে মানুষের ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটবে। অবিলম্বে দ্রব্যমূল্যের চলমান ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। একই সাথে নিম্ন আয়ের খেটে মানুষদের স্বল্পমূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রদান করতে দাবি জানাচ্ছি। যে সকল শ্রমিকরা কর্মহীন তাদের কর্মসংস্থান হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে খাদ্যদ্রব্যসহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যোগান দিতে হবে। কর্মঅক্ষম ও কর্মক্ষেত্রে আহত পঙ্গুত্ববরণকারী শ্রমিকদের জন্য বিশেষ ভাতা দিতে হবে। গার্মেন্টস শ্রমিকসহ সকল সেক্টরে নিয়োজিত শ্রমিকদের বেতন বর্তমান বাজারের আলোকে পুনঃনির্ধারণ করতে হবে। অনানুষ্ঠানিক খাতে শ্রমিকদের জন্য বিশেষ রেশনিং কার্ডের ব্যবস্থা করতে হবে।

সরকার কর্তৃক উন্মুক্ত মদের লাইসেন্স দেওয়ায় তীব্র নিন্দা ও জাতি বিদ্বেষী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি।

উন্মুক্ত মদের লাইসেন্স দিয়ে সরকার জাতিকে পথভ্রষ্ট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে- শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান গত ২৩ ফেব্রুয়ারি বুধবার এক যৌথ বিবৃতিতে,

সরকার কর্তৃক উন্মুক্ত মদের লাইসেন্স প্রদানের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি দেশ। ইসলাম মদকে হারাম ঘোষণা করেছে। অথচ সরকার সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে উন্মুক্তভাবে মদের লাইসেন্স দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যা দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের অন্তরে আঘাত হেনেছে। উন্মুক্ত মদের লাইসেন্স দিয়ে সরকার জাতিকে পথভ্রষ্ট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকারের এই জাতি বিদ্বেষী সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার বিভিন্ন সময়ে জাতিকে পথভ্রষ্ট করার কূট-কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। উন্মুক্ত মদের লাইসেন্স দেওয়ার সিদ্ধান্ত সেই ধারাবাহিকতার অংশ। আমরা বলতে চাই, সকল ধরনের মাদকদ্রব্য মানুষের নীতি-নৈতিকতা ধ্বংস করে। একই সাথে মানুষের দৈহিক ও মানসিক ক্ষতি সাধন করে। পরিবার ও সমাজে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা ডেকে আনে। ইসলাম কল্যাণমুখি ধর্ম। তাই যা মানুষ ও রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করে তা সম্পূর্ণরূপে হারাম করেছে। মদ তেমনই একটি নেশা জাতীয় পণ্য। ইসলামের বিধান মতে মাদক গ্রহণ হারাম ও অপবিত্র। রাসূল (সা.) বলেছেন, মদ্যপানকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বর্তমান সরকার বিভিন্ন সময়ে ইসলামী বিধি নিষেধকে অবজ্ঞা করার চেষ্টা করেছে। তারা ইসলাম, ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী তাহযিব–তমদ্দুনকে ধ্বংসের পায়তারা করছে। ইসলামের বিধি-বিধান নিয়ে সরকার আত্মঘাতি খেলায় মেতে উঠেছে। আমরা সরকারের উদ্দেশ্যে স্পষ্টভাষায় বলতে চাই, ইসলাম এদেশের মানুষের প্রাণপ্রিয় ধর্ম বিশ্বাস। ইসলামের ওপর অতীতে কোন আঘাত এসেছে কিন্তু মুসলমানরা ঘরে বসেছিল এমনটি ঘটেনি। বরং ইসলামের ওপর আসা প্রত্যেকটি আঘাতের সমুচিত জবাব দেশের ধর্মপ্রাণ জনগণ অতীতে বহুবার দিয়েছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে আপনারা এই অযাচিত সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি। অন্যথায় দেশের জনগণ আপনাদের অবৈধ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে রাজপথে নেমে আসতে বাধ্য হবে।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষন

চট্টগ্রাম অঞ্চলের উদ্যোগে জেলা-মহানগরীর ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদকদের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম অঞ্চলের উদ্যোগে জেলা ও মহানগরীর ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদকদের নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম মহানগর সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমানের সঞ্চালনায় ও ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের পরিচালক কবির আহমদের সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের চট্টগ্রাম মহানগরীর অন্যতম উপদেষ্টা বিশিষ্ট পরিবেশ বিজ্ঞানী মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও চট্টগ্রাম মহানগর সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খান, উত্তর জেলা সভাপতি ইউসুফ বি আবু বক্কর, কক্সবাজার জেলার সাধারন সম্পাদক মুহাম্মদ মহসিন।

চট্টগ্রাম মহানগরীর ইউনিট প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর উদ্যোগে ইউনিট প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের চট্টগ্রাম মহানগরী সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের চট্টগ্রাম মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা মুহাম্মদ শাহজাহান। প্রধান বক্তার বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরী উপদেষ্টা অধ্যক্ষ মাওলানা খায়রুল বাশার।

সিলেট জেলা দক্ষিণের উদ্যোগে বাছাইকৃত কর্মীদের নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট জেলা দক্ষিণ শাখার উদ্যোগে বাছাইকৃত কর্মীদের নিয়ে কর্মশালায় অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সভাপতি ফখরুল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক হাফিজ আতিকুল ইসলামের পরিচালনায় কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের সিলেট অঞ্চলের প্রধান উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট এহ-সানুল মাহবুব জুবায়ের। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সিলেট দক্ষিণ জেলার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক আব্দুল হান্নান, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও সিলেট অঞ্চল পরিচালক মাওলানা সোহেল আহমদ। ফেডারেশনের জেলা উপদেষ্টা মাওলানা নজরুল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন জেলা সহ-সভাপতি রেহান উদ্দিন রায়হান, সহ-সাধারণ সম্পাদক জাহেদুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ আব্দুল মুমিন ও এনাম আহমদ প্রমুখ।

রাজশাহী জেলা পূর্বের উদ্যোগে উপজেলা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রাজশাহী জেলা পূর্বের উদ্যোগে উপজেলা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সম্মেলন অনুর্ষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের জেলা সভাপতি শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুনের পরিচালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মজিবুর রহমান ভূঁইয়া , ফেডারেশনের রাজশাহী জেলা পূর্বের প্রধান উপদেষ্টা রেজাউর রহমান।

নাটোর জেলার কার্যকরী পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নাটোর জেলার উদ্যোগে কার্যকরী পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের জেলা সভাপতি ড. মোঃ জিয়াউল হকের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ আফতাব উদ্দিনের পরিচালনায় কার্যকরী পরিষদের অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মজিবুর রহমান ভূঁইয়া , ফেডারেশনের রাজশাহী অঞ্চলের সদস্য মাওঃ মোঃ আব্দুস সবুর।

ঢাকা দক্ষিণ অঞ্চলের উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়ন দায়িত্বশীলদের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা দক্ষিণ অঞ্চলের উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়ন দায়িত্বশীলদের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অঞ্চল পরিচালক অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসেনের সভাপতিত্বে ও অঞ্চলের সহকারী পরিচালক এস এম শাহজাহানের পরিচালনায় কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান । এসময় ঢাকা দক্ষিণ অঞ্চলের জেলা, মহানগরী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণ উপস্থিত ছিলেন।

রংপুর মহানগরীর উদ্যোগে থানা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রংপুর মহানগরী উদ্যোগে থানা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। রংপুর মহানগরী সভাপতি অ্যাডভোকেট মোঃ কাওছার আলীর সভাপতিত্বে শিক্ষা বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও রংপুর অঞ্চলের পরিচালক মোঃ গোলাম রব্বানী। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের রংপুর মহানগরী প্রধান উপদেষ্টা এ টি এম আজম খান, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও রংপুর অঞ্চলের সহকারী পরিচালক মোঃ আবুল হাসেম বাদল।

নরসিংদী জেলার উদ্যোগে দিনব্যাপী সদস্য শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নরসিংদী জেলা শাখার উদ্যোগে দিনব্যাপী সদস্য শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সভাপতি শামসুল ইসলাম তালুকদারের সভাপতিত্বে ও সহ-সভাপতি আব্দুর রশীদ হাশেমীর সঞ্চালনায় শিক্ষা শিবিরে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের জেলা প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মাওলানা মুছলেহউদ্দীন। প্রধান বক্তা হিসেবে আলোচনা পেশ করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কবির আহমদ। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলার অন্যতম উপদেষ্টা উপাধ্যক্ষ মাওলানা আমজাদ হোসাইন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকরি কমিটির সদস্যদের সম্মেল অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকরি কমিটির সদস্যদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরি পরিষদের সদস্য ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সভাপতি মোঃ কামাল হোসেনের সভাপতিত্বে ও জেলা সাধারণ সম্পাদক মোঃ ইব্রাহীম খলিলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মোঃ মজিবুর রহমান ভূঁইয়া। প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলার প্রধান উপদেষ্টা মোঃ আবুজর গিফারী, অঞ্চল সহকারী পরিচালক অধ্যক্ষ মোঃ আব্দুস সবুর। এছাড়াও আরও বক্তব্য রাখেন শ্রমিক নেতা সাইদুর রহমান, মাওলানা ওমর ফারুকসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

লক্ষ্মীপুর জেলার উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়ন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন লক্ষ্মীপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়ন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সভাপতি মমিন উল্লাহ পাটওয়ারী সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আবুল খায়ের মিয়ার পরিচালনায় কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের জেলা উপদেষ্টা এ আর হাফিজ উল্লাহ্ । বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের সাবেক জেলা সভাপতি অ্যাডভোকেট মুহসিন কবির মুরাদ , জেলা উপদেষ্টা মাওলানা নাসির উদ্দিন মাহমুদ। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সহ-সভাপতি মাওলানা হুমায়ন কবির, সহ-সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আবুল বাশার, ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল হাকিম ও লক্ষ্মীপুর শহর শাখার সভাপতি মঞ্জুরুল আলম মিরন প্রমূখ।

ঢাকা জেলা উত্তরের আশুলিয়া থানার উদ্যোগে কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা জেলা উত্তরের আশুলিয় থানার উদ্যোগে কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। থানা সভাপতি ফয়জুল হকের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলমের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও ঢাকা উত্তর অঞ্চলের পরিচালক মোঃ মনসুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের ঢাকা উত্তর জেলার সভাপতি অধ্যক্ষ হারুন রশিদ। এসময় স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দসহ জেলার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সাতকানিয়া উপজেলার উদ্যোগে প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যান ফেডারেশন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সাতকানিয়া উপজেলার উদ্যোগে প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সাতকানিয়া উপজেলা সভাপতি রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ইউনুসের পরিচালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও চট্টগ্রাম অঞ্চল পরিচালক কবির আহমদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা সভাপতি নুরুল হোসাইন, কক্সবাজার জেলা সভাপতি সামশুল আলম বাহাদুর এবং সাতকানিয়া উপজেলার উপদেষ্টা তারেক হোসাইন। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন সাতকানিয়া উপজেলা শ্রমিক নেতা জনাব নুরুল হাকিম,খানে আলম,মস্তফিজুর রহমান, আনোয়ার হোসেন, নুরুন্নবী প্রমুখ।

নওগাঁ জেলা পূর্ব শাখার উদ্যোগে ইউনিয়ন দায়িত্বশীল সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নওগাঁ জেলা পূর্ব শাখার উদ্যোগে ইউনিয়ন দায়িত্বশীল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও জেলা সাধারণ সম্পাদক মোঃ আমিনুল ইসলামের পরিচালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথির

বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের নওগাঁ জেলার প্রধান উপদেষ্টা খন্দকার আব্দুর রাকিব। প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও রাজশাহী জোনের সহকারী পরিচালক অধ্যক্ষ আব্দুস সবুর ।

সিলেট মহানগরী কার্যকরী পরিষদের সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট মহানগরীর উদ্যোগে কার্যকরী পরিষদের প্রথম সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সিলেট মহানগর সভাপতি অ্যাডভোকেট জামিল আহমদ রাজুর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মিয়া মোহাম্মদ রাসেলের পরিচালনায় কার্যকরী পরিষদের অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের সিলেট মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা ও সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ ফখরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের সিলেট অঞ্চল পরিচালক ও কেন্দ্রীয় সহ-সাধারন সম্পাদক সোহেল আহমদ, বক্তব্য রাখেন মহানগর সহ-সাধারণ সম্পাদক কফিল উদ্দিন আলমগীর ও আব্বাছ আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আব্দুল্লাহ।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা দর্জি শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে বার্ষিক সাধারণ সভা ও বনভোজন অনুষ্ঠিত

চাঁপাইনবাবগঞ্জ দর্জি শ্রমিক ইউনিয়নের (রেজিঃ-রাজ-৩২২৬) উদ্যোগে বার্ষিক সাধারণ সভা ও বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়নের সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আশিক পারভেজের পরিচালনায় সাধারণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা নুরুল ইসলাম বুলবুল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রাব্বানী , চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম, সাবেক সংসদ সদস্য লতিফুর রহমান। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা আবুল হাসান, আমানুল্লাহ, কামাল উদ্দিন, আলাউদ্দিন, সাইদুর রহমান প্রমুখ।

লক্ষ্মীপুর জেলা দোকান শ্রমিক ইউনিয়নের বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত

লক্ষ্মীপুর দোকান শ্রমিক ইউনিয়ন (চট্ট-২৩২৬) এর উদ্যোগে বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়নের সভাপতি শরীফুল ইসলামের সার্বিক ব্যাবস্থাপনায় উক্ত বনভোজনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের লক্ষ্মীপুর জেলা সহ-সভাপতি ও কমলনগর উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান মাওলানা হুমায়ুন কবির। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের লক্ষ্মীপুর শহর শাখার উপদেষ্টা উপাধ্যক্ষ হারুনুর রশিদ, শহর সভাপতি মঞ্জুরল আলম মিরন, সহ-সভাপতি ডাঃ হারুন দেওয়ান, সহ-সভাপতি মাহফুজ খন্দকার প্রমূখ।

শাহপরান থানা রিকশা শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

সিলেট মহানগরীর শাহপরান থানা রিকশা শ্রমিক ইউনিয়নের (সিলেট-২৫) উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়ন সভাপতি ইদ্রিস আলীর সভাপতিত্বে সাধারণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সিলেট মহানগরীর সভাপতি অ্যাডভোকেট জামিল আহমদ রাজু। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের সিলেট মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক মিয়া মোহাম্মদ রাসেল, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুল বাছেত মিলন, শাহপরণ থানার সভাপতি মুহিবুর রহমান শামীম প্রমুখ।

শোক বাণী

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আ ন ম শামসুল ইসলাম এর মেজো ভাই এ এস এম রফিকুল ইসলামের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি মজলুম জননেতা আ ন ম শামসুল ইসলাম এর মেজো ভাই বিশিষ্ট ব্যাংকার এ এস এম রফিকুল ইসলাম (৭২) এর ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান।

শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন ও তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। নেতৃবৃন্দ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে মরহুমের নেক আমল সমূহ কবুল করে তাঁকে জান্নাতবাসী ও আত্মীয়স্বজনকে ধৈর্য ধরার শক্তি দান করার জন্য দোয়া করেন। উল্লেখ্য মরহুম এ এস এম রফিকুল ইসলাম গত ১৫ মার্চ ভোর রাত ৩ টায় নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যকালে তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র ও ১ মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমের জানাযা জোহরের নামাজের পর চট্টগ্রাম জমিয়াতুল ফালাহ মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। আ ন ম শামসুল ইসলাম প্যারোলো মুক্তি পেয়ে মরহুমের জানাযা নামাজে ইমামতি করেন। দ্বিতীয় জানাযা নামাজ মরহুমের গ্রামের বাড়ী চট্টগ্রাম জেলার সাতানিয়া উপজেলার বারদুনা গ্রামে বাদ মাগরিব অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে মরহুমকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

মরহুমের জানাযায় অংশগ্রহণ করেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের চট্টগ্রাম মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা মুহাম্মদ শাহজাহান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরীর উপদেষ্টা আ জ ম ওবায়েদুল্লাহ, নজরুল ইসলাম, অধ্যক্ষ মুহাম্মদ নুরুল আমীন, ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ চট্টগ্রামের সভাপতি এম তাহের, ফেডারেশনের উপদেষ্টা খায়রুল বশর, মুহাম্মদ উল্লাহ, ফয়সাল মুহাম্মদ ইউনুছ, এম এ আলম চৌধুরী, ফেডারেশনের চট্টগ্রাম মহানগরী সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খান, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ইছহাক, এস এম লুৎফর রহমান, মরহুমের ছোট ভাই আমিরুল ইসলাম, ছাত্রনেতা নোমান রশিদ প্রমুখ।

শ্রমিক নেতা এস এম লুৎফর রহমান এর পিতার ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম মহানগরী সাধারণ সম্পাদক শ্রমিক নেতা এস এম লুৎফর রহমানের সম্মানিত পিতা জনাব বজলুর রহমান (৮২) ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান।

শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। নেতৃবৃন্দ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে মরহুমের নেক আমল সমূহ কবুল করে তাকে জান্নাতবাসী ও আত্মীয়স্বজনকে ধৈর্য ধরার শক্তি দান করার জন্য দোয়া করেন।

উল্লেখ্য মরহুম বজলুর রহমান গত ১ মার্চ বিকালে নিজ বাড়িতে বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যকালে তিনি ৬ পুত্র ও ৬ মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমের জানাযা নামাজ ২ মার্চ সকাল ১১ টায় চট্টগ্রাম জেলার লোহাগড়া উপজেলার চুনতি ইউনিয়নের নারিচ্ছা জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। মরহুমের জানাযা নামাজে ইমামতি করেন মরহুমের পুত্র এস এম লুৎফর রহমান।

মরহুমের জানাযায় অংশগ্রহণ করেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের চট্টগ্রাম মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা মুহাম্মদ শাহজাহান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরীর উপদেষ্টা নজরুল ইসলাম, বান্দরবান জেলার প্রধান উপদেষ্টা আব্দুস সালাম আজাদ, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক নূরুল আমিন, ফেডারেশনের মহানগরীর উপদেষ্টা মাওলানা খায়রুল বাশার, অধ্যক্ষ শামসুজ্জামান হেলালী, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার উপদেষ্টা ড. হেলাল উদ্দিন মুহাম্মদ নোমান, ফেডারেশনের কক্সবাজার জেলা সভাপতি শামসুল আলম বাহাদুর, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা সাধারণ সম্পাদক আরিফুর রশিদ, বান্দরবান জেলা সাধারণ সম্পাদক তৌফিকুল ইসলাম, ফেডারেশনের মহানগরী সহ-সভাপতি ডা. আব্দুল ওয়াসী, সহ-সাধারণ সম্পাদক মকবুল আহমদ, শ্রমিক নেতা নুরুন্নবী, হামিদুল ইসলাম, আবু তালেব চৌধুরী, কামাল উদ্দিন আহমদ প্রমুখ। মরহুম বজলুর রহমানের ইন্তিকালে আরও শোক প্রকাশ করেছেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের পরিচালক কবির আহমেদ, কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও চট্টগ্রাম মহানগরী সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খান।

শ্রমিক নেতা তাজুল ইসলামের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের নোয়াখালী জেলার সহ-সভাপতি বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা মোঃ তাজুল ইসলাম-এর ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান। শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ বলেন, মরহুম তাজুল ইসলাম আমৃত্যু ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে গেছেন। অসহায় মেহনতি মানুষের মুক্তি সংগ্রামে সর্বদা নির্ভীক ছিলেন। শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। নেতৃবৃন্দ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে মরহুমের নেক আমল সমূহ কবুল করে তাকে জান্নাতবাসী ও আত্মীয়স্বজনকে ধৈর্য ধরার শক্তি দান করার জন্য দোয়া করেন।

উল্লেখ্য মরহুম মোঃ তাজুল ইসলাম গত ১২ মার্চ সকাল ৭ টায় ঢাকায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন)। তিনি দীর্ঘদিন যাবত কিডনি রোগে আক্রান্ত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও ১ মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমের জানাযা নামাজ গতকাল বিকাল ৫ টায় নোয়াখালী জেলার চাটখিল উপজেলার নিজ বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। মরহুমের জানাযায় অংশগ্রহণ করেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের নোয়াখালী জেলার প্রধান উপদেষ্টা ইসহাক খন্দকার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলার উপদেষ্টা নিজাম উদ্দিন ফারুক, ফেডারেশনের জেলা সভাপতি এডভোকেট জহিরুল আলম, সহ-সভাপতি নুরুল ইসলাম, মেজবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া, সাধারণ সম্পাদক মিজানুল হক মামুন প্রমুখ।

শ্রমিক নেতা আবুল হাশেম বাদল এর মাতার ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরি পরিষদের সদস্য, রংপুর অঞ্চলের সহকারি পরিচালক ও স্থলবন্দর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শ্রমিক নেতা আবুল হাশেম বাদল এর সম্মানিত মাতা হাজেরা খাতুনের (৯৫) ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান। শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ মরহুমার রুহের মাগফেরাত কামনা করেন ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। নেতৃবৃন্দ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে মরহুমার নেক আমল সমূহ কবুল করে তাকে জান্নাতবাসী ও আত্মীয়স্বজনকে ধৈর্য ধরার শক্তি দান করার জন্য দোয়া করেন।

উল্লেখ্য মরহুমা হাজেরা খাতুন গত ২৬ ফেব্রুয়ারি সকাল ৭.২০ মিনিটে নিজ বাড়িতে বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যকালে তিনি ৪ পুত্র ও ১ মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমার জানাযা নামাজ দুপুর ২.৩০ মিনিটে রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার সেরুডাঙ্গার গ্রামের নিজ বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়। মরহুমের জানাযায় অংশগ্রহণ করেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের রংপুর মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা এ টি এম আজম খান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের উপদেষ্টা ওবাইদুল্লাহ সালাফি, রংপুর জেলার উপদেষ্টা মওলানা এনামুল হক, অধ্যাপক নূর হোসেন, ফেডারেশনের রংপুর মহানগরী সভাপতি অ্যাডভোকেট কাওসার আলী, কুড়িগ্রাম জেলা সভাপতি অ্যাডভোকেট ইয়াসিন আলী সরকার, লালমনিরহাট জেলা সভাপতি রেনায়েল আলম প্রমুখ।

ইসলামী বইয়ের বিশাল সমাহার
৩০% কমিশনে সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে

ক্রম	বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
১	ইসলাম ও শ্রমিক আন্দোলন	ড. জামাল আল বান্না	১০০/-
২	যিকির ও দোয়া	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	৪০/-
৩	কুরআন ও হাদীসের আলোকে শিরক ও বেদায়াত	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১৩০/-
৪	ইসলামী আন্দোলনে শ্রমজীবি মানুষের গুরুত্ব ও ইউনিয়ন গঠন পদ্ধতি	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১৫/-
৫	ইসলামী শ্রমনীতি	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	৪০/-
৬	ইসলামী সমাজে শ্রমজীবি মানুষের মর্যাদা	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	২০/-
৭	ঐতিহাসিক ভাষন	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১০/-
৮	হাদীসের আলোকে মালিক-শ্রমিকের অধিকার ও দায়িত্ব	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১৫/-
৯	শ্রমিক সমস্যার সমাধান	অধ্যাপক গোলাম আজম	১৫/-
১০	শ্রমিক আন্দোলন ও মাওলানা মওদুদী	সাইয়েদ মাওলানা মওদুদী	১৫/-
১১	বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬	মো: আশরাফুল হক	১৩০/-
১২	ট্রেড ইউনিয়ন গাইড লাইন	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন	৪০/-
১৩	ইসলামী শ্রমনীতির সুফল	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন	১৫/
১৪	ট্রেড ইউনিয়ন কাজের পদ্ধতি	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন	১০/-
১৫	তৃণমূল পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন ও ইসলামী আন্দোলন	কবির আহমদ মজুমদার	২৫/-
১৬	শ্রম আইন ও শ্রমিক কল্যাণ	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১০/-
১৭	আল কুরআনের পাতায় শ্রম শ্রমিক শিল্প	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১৫/-
১৮	মহিলা শ্রমিকের অধিকার	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১২/-
১৯	শ্রমিকের অধিকার	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১৫/-
২০	শিশু অধিকার	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১০/
২১	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কি ও কেন	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	৭/-
২২	Introduction to (BSKF)	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	২০/-
২৩	Islam & Rights of Labours	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১৫/-
২৪	ইসলামী আন্দোলনে মহিলা কর্মীর দায়িত্ব ও কর্তব্য	বেগম রোকেয়া আনছার	২২/-

কল্যাণ প্রকাশনী
৪৩৫ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
যোগাযোগ : ০১৮৭৬৯৯০১৮৬, ০১৯৯২৯৫১৩৬৪

ওমরাহ্ পালনে আবাবিলে স্বাগতম ওমরাহ্ বুকিং চলছে

ওমরাহ্ লাইসেন্স নং-৫১৪ ● হজ্জ লাইসেন্স নং-৬২০

ওমরাহ প্যাকেজ ২০২২

৭ রাত ৮ দিন/ ১২ রাত ১৩ দিন

১,৪০,০০০ টাকা

মক্কা : ফজর আল বদী-১, ৪, ৫ ও সমমান

মদিনা : (শেয়ারিং) তাজ, করম আল হেজাজ, রাশেদী

ভিআইপি ২,২০,০০০ টাকা

মক্কা : হিলটন, জমজম, ইলাফ কেন্দা, দার আল হিজরা

মদিনা : আনোয়ার মভিনপিক, তায়্যিবা, হিলটন, ইন্টারকন্টিনেন্টাল

বুকিং-এর জন্য প্রযোজ্য

বুকিং মানি ৭০,০০০ টাকা, পাসপোর্ট, এনআইডি ফটোকপি, টিকা প্রদানের সার্টিফিকেট ।

বি.দ্র. ভিসা এবং ফ্লাইট-এর সিডিউলের কারণে প্যাকেজের সময় পরিবর্তনশীল । এ বছর অনলাইনে অগ্রিম টাকা পরিশোধের কারণে ফ্লাইট-এর ৬ (ছয়) দিন পূর্বে প্যাকেজের সকল টাকা অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে ।

ব্যাংক একাউন্ট

আল মারিয়া ট্রাভেলস

চলতি হিসাব নং-এস.এন.ডি-১৬১

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, পল্টন শাখা, ঢাকা

Member of ATAB

Biman BANGLADESH AIRLINES

IATA

করোনা পজিটিভ হলে যেতে পারবেন না

আবাবিল হজ্জ গ্রুপ

দেশের শীর্ষস্থানীয় হজ্জে প্রেরণকারী প্রতিষ্ঠান

শুভেচ্ছান্তে

আলহাজ্ব মোঃ আবু ইউসুফ

৫৫/এ সিদ্দিক ম্যানশন (৭ম তলা), পুরানা পল্টন ঢাকা-১০০০ ।

ফোন : +৮৮-০২৯৫১৩১১৪
মোবা : ০১৭০৫-৩৪০৬২৬
০১৭৮৪-৩৯৫৮২৩
০১৮১৮-৬৪৫২৪৯

Imo & Whatsapp : 01705340626
E-mail : ababil358@yahoo.com
Web : www.ababilhajjbd.com

বিন্দু প্রকাশের বইসমূহ
যাকাত ও 'উশর
রামাদান
ঈমান ইসলাম
মোহাম্মদ মসিউল আলম
মিশর ও ইখওয়ান
আরব উপদ্বীপ
সিরিয়া
আল ইরাক
স্পেন
মিশর
ইয়ুথ প্রবলেম
ইসলামী আন্দোলন ও আমাদের ঘর
ছড়ায় ছন্দে জীবন গড়ি
হাতি আর পাখির যুদ্ধ
শিশুর মুখে ইসলাম
মুদ্রিত মূল্য ২৫০/-
বিক্রয় মূল্য ১৫০/-
বিন্দু প্রকাশ
১১৩, গিয়াস গার্ডেন বুকস কমপ্লেক্স, ৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
২১৩, সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, পুরানা পল্টন ঢাকা-১০০০, মোবাইল: ০১৭৯২ ৭৭১৬৬৫
binduprokash2019@gmail.com

অবিস্মরণীয় সাফল্যগাঁথা
মেডিকেল কলেজ ভর্তি পরীক্ষা ২০২০-২১
২য়
১ম
৪র্থ
তানভীন
মুনমুন
রাকিবুল
প্রথম ১০ এ ৮ জন
ডিএমসি তে ১৫৫ জন সহ
সর্বমোট চান্সপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী ৩১০৩+ জন
রেটিনা